মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৬ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা

নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মার্চ ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শুধুই এগিয়ে যাবার স্বপ্ন

সারা যাকের

ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আমদের প্রজন্ম যে সময়টাতে এবং যে পারিপার্শ্বিকতায় বেড়ে উঠেছি, আমাদের মধ্যে তখন দেশর জন্য কিছু একটা করতে হবে এই ভাবনাটা প্রবল ছিল, আর আমার জন্য প্রধান ক্ষেত্রটা ছিল মঞ্চ। এ সময়েই আমি যুক্ত হলাম সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার এক মহতী উদ্যোগের সাথে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে এর প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তখন নির্বাসনে, নতুন প্রজন্ম শিখছে ভ্রান্তিতে ভরা এক ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন আমরা ভেবেছিলাম যে নিরপেক্ষ ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এই জাদুঘরকে ঘিরে এমন কার্যক্রম শুরু করা হবে যাতে করে জাদুঘর প্রাঙ্গণ সব সময়ে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর থাকবে, জাদুঘর কেবল পুরোনো জিনিষপত্র সাজিয়ে রাখার স্থান এই ভাবনাতেও পরিবর্তন আনতে হবে। তাই নানান ধরণের আয়োজন করা হতো নিয়মিত। সেগুনবাগিচার ছোট্ট পরিসরের জাদুঘরের বড়ো আকর্ষণ ছিল এর উন্মুক্ত চত্বর আর ভিন্ন আঙ্গিকের এক মঞ্চ। এই উন্মুক্ত চত্বরে মিলিত হতেন শিল্পীরা, সাংস্কৃতিক কর্মীরা, বরেণ্য সাহিত্যিকরা, শিক্ষাবিদরাসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। মঞ্চটি খুব বড়ো ছিল না, কিন্তু দেশের এবং দেশের বাইরের সর্ব্বোচ্চ গুণি শিল্পীদের পরিবেশনায় মঞ্চটি ধন্য হয়েছে। আমরাও নাটকের দল নিয়ে নাটক পরিবেশন করেছি এখানে। খুব মনে পড়ছে 'স্মৃতিস্বত্ত্বা-'৭১' নাটকটির কথা। জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' বইকে কেন্দ্র করে কৃষক বিদ্রোহী নূরলদীনের 'সংগ্রাম', বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামের কথা দিয়ে নাটকটি সাজানো হয়েছিল। জাদুঘর তার বহুমাত্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিনত হলো। যাত্রা শুরুর সময়ে আমাদের স্বপ্ন ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে আন্তর্জাতিক মানের জাদুঘরে পরিনত করা। কত মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানে সেই স্বপ্নটি আজকে বাস্তবে রূপ পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন স্কুল শিক্ষার্থী এই জাদুঘরের অংশী হয়েছেন।

এই মুহূর্তে যখন আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তখন নিজস্ব ঠিকানায় সুবৃহৎ পরিসরের আধুনিক ভবনে এই জাদুঘরটি স্থাপত্য, প্রদর্শনী প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে কোন আন্তর্জঅতিক জাদুঘরের সমকক্ষ। ২৫ বছর ধরে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা মিলিতভাবে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জায়গা থেকেই এটি সম্ভব হচ্ছে। যখন ভাবছি এই ২৫ বছর উদযাপনের দিনে প্রতিষ্ঠাতাদের তিনজন আমাদের সাথে নেই তখন অর্জনের আনন্দগুলো কিছুটা মলিন হচ্ছে। আবার আশান্বিত হই জাদুঘরের দক্ষ কর্মীদলের কথা ভাবলে। জাদুঘরের কর্মীদল সংখ্যায় সীমিত, এই ক্ষুদ্র দলটি তাদের শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে জাদুঘরের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযুক্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারীকালে প্রযুক্তির মাধ্যমেই জাদুঘর যুক্ত ছিল বিশ্বের সাথে। তবে এ ক্ষেত্রটি রয়েছে উন্নতির অবকাশ। আশা রাখছি খুব দ্রুতই প্রযুক্তি- ক্ষেত্রের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে আমরাও আন্তর্জাতিকমানের সক্ষমতা অর্জন করবো।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ : প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কার্যক্রম শুরু হয়

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)

১৯৯৬-র ২২ মার্চ এক বৃষ্টি ভেজা অপরাহ্নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আমার স্মৃতিতে ধারণ করা স্বল্প কিছু স্মৃতিময় ঘটনাগুলোর একটি ছিল ঘটনাটি। আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্যে আমি প্রত্যক্ষদর্শীও বটে। আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম ইতিহাসের যাত্রা শুরু। স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরুও প্রত্যক্ষ করেছিলাম; বাংলাদেশের স্বাধীন হয়ে ওঠার ইতিহাস ধারণ করা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরুও প্রত্যক্ষ করলাম- সৌভাগ্য বলতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে এ জাদুঘর ২৫ বছরপূর্ণ করছে; এর মানে হলো, স্বাধীনতা অর্জনের পর ২৫ বছর পেরিয়ে যাবার পর মুক্তিযুদ্ধকে ধরে রাখার উদ্যোগ নেয়া হলো; তা-ও আবার বেসরকারি পর্যায়ে, এবং তা কিছু মানুষের ঐকান্তিক উদ্যোগে। কাজটি সরকারিভাবেই হওয়া উচিৎ ছিল; তা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ না হলে, বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে বাংলাদেশে কী এমন সরকার থাকতে পারতো? অবশ্যই নয়। সরকার মানে যদি হয় ক্ষমতা+সুবিধা, তা হলেও এ দায়িত্ব সরকারের অগ্রগণ্যতা বাস্তব হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু তা হয়নি। ২০০১-এ বিএনপি-জামাত সরকার বাংলা একাডেমির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের যাবতীয় উপকরণ-জনবল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় করেছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, রাজাকার প্রভাবিত সরকার মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় করেছিল! অবশ্য কাজের কাজ কিছু হয়নি। বর্তমান সরকার বারো বছরের বেশি ক্ষমতায়; এ সময়েও কাজ কিছুই হয়নি। একটি রাজাকারের তালিকা করে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে; কারণ তাতে মুক্তিযোদ্ধার নামছিল। এখন মন্ত্রণালয়টি মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়ন করছে। আশা থাকছে একটি নির্ভুল তালিকার জন্য। মোটা দাগে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ ও লালনে সরকারি ভূমিকা নেই বা থাকলেও যৎসামান্য।

এমন সরকারি ভূমিকার হতাশাব্যঞ্জক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সৃষ্টি ও বিগত ২৫ বছরের ভূমিকা আমাদের অহ-ংকার। অবশ্য বর্তমান সরকারের সৌজন্যে একটি সুপরিসর জায়গা পাওয়া গেছে। এর ফলে সেগুন বাগিচার ভাড়া করা ছোট বাড়ি থেকে জাদুঘরটি এখন আগারগাঁওয়ে বড় বাড়িতে স্থানান্তরিত হতে পেরেছে। তাজ্জব ব্যাপার! এক্ষেত্রেও জাদুঘরটি এক জাদুকরি দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

যাদের দানে-অবদানে, শ্রমে-ঘামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের হয়ে ওঠা ও পথ চলা তাদেরকে ইতিহাস ধারণ করে রাখবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্য নিবেদিত প্রাণ এ মানুষগুলো প্রযত্ন পর্ষদের সদস্য, যারাসবাই ইতিহাসের অংশ। এরা হলেন: ১. ডা. সারওয়ার আলী, ২. মফিদুল হক, ৩. আলী যাকের (প্রায়ত), ৪. আসাদুজ্জামান নূর, ৫. রবিউল হুসাইন (প্রায়ত), ৬. জিয়াউদ্দীন তারিক আলী (প্রায়ত); ৭. সারা যাকের এবং ৮. আক্কু চৌধুরী।

আমার জানা তথ্য অনুযায়ী, বাড়িটি নির্মাণ করতে হয়েছে সংগৃহীত অর্থে। আরও জানি, নির্মাণ কাজে প্রযত্ন পর্ষদের কেউ সম্পৃক্ত ছিলেন না। এত বড় বিশেষায়িত বাড়ি তৈরি হলো; কিন্তু কোন দুর্নীতি হলো না- বাংলাদেশের মতো দেশে এ এক মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের অহংকারের বাতিঘর। প্রত্যাশা থাকছে, এ বাতিঘর থেকে বিচ্ছুরিত অহংকারের আলোয় আ-মরা উজ্জীবিত থাকি যুগযুগ ধরে। তাই বলি, এ আলো আমার আলো।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জনগণের জাদুঘর

ডা. সারওয়ার আলী
ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে আটজন মধ্যবয়সী যুবক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ ও সর্বজনের কাছে বাঙালির সংগ্রাম ও আত্মদানকে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সেগুনবাগিচায় এক ভাড়া বাড়িতে স্বল্প পরিসরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিল। সাথে ছিল স্বল্প সংখ্যক স্বেচ্ছাকর্মী। আজ সেটি আগারগাঁওয়ে সুবৃহৎ অট্টালিকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। কর্মসূচি ভিত্তিক এ জাদুঘরে সারাটি বছর জুড়ে চলে নানা মাত্রার কর্মযজ্ঞ। এটি পরিণত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ স্মারক ও দলিলের সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালায়। এখনও মুক্তিযুদ্ধের অজানা ইতিহাসের সন্ধানে চলে গবেষণা কর্ম। অন্যতম লক্ষ ছিল নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীর পরিচয় সাধন। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় একবার পরিভ্রমণ শেষ করেছে। গত দশক ধরে বাংলাদেশের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচি কার্য্যকর করে চলেছে।

এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে সর্বজনের সহায়তায়। দেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস বিকৃতি রোধের চাহিদা ছিল। তাই শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের সযত্নে সংরক্ষিত প্রিয় সম্পদটি (মুক্তিযুদ্ধের স্মারক) আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধ সময়ের ঐতিহাসিক দলিল ও সংবাদপত্রের কার্টিং। অর্থের প্রয়োজন পড়েছে– আগারগাঁওয়ের জমিটি প্রদান করেছেন সরকার আর নির্মাণব্যয়ের অর্ধেক সরকার থেকে প্রাপ্ত ও বাকিটা সর্বস্তরের জনগণের। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের কার্যক্রমের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছেন, সারা দেশের শিক্ষকমণ্ডলী। আমরা এ কাজটির উদ্যোগ নিয়েছি মাত্র, এটি সর্বজনের সহায়তায় হয়ে উঠেছে জনগণের জাদুঘরে। একটি দুঃখবোধ রয়ে গেছে। সেগুনবাগিচার জীর্ণ দোতলা বাড়িটিকে জাদুঘরে রূপান্তরিত করেছিলেন স্থপতি রবিউল হুসাইন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আলী যাকের প্রস্তাব করেছিলেন জাদুঘরের cut off point ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, তার ফলে জাদুঘর বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে পেরেছে। আগারগাঁওয়ের এই বিশাল ভবন নির্মাণের প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন প্রকৌশলী তারেক আলী। তারা গত এক বছরে প্রয়াত হয়েছেন, তারা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তীতে উপস্থিত থাকতে পারছেন না। এই তিনজন প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টিদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা রইল।

মনে পড়ে

মফিদুল হক, *ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

দেখতে দেখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলার পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে চললো। রজত জয়ন্তীর এই লগ্নে কত মানুষের কত স্মৃতি কত অবদানের কথা মনে পড়ে! সেইসব অবদানের যোগফল মিলিয়েই তো জাদুঘরের বিকাশ, শক্তি আহরণ এবং ক্রমাগত সমৃদ্ধি অর্জন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রাণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করেছেন অগণিত মানুষ, তাঁদের ভূমিকা পালনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে জাদুঘর এবং তারা উজাড় করা ভালোবাসা ও সহায়তার হাত প্রসারিত করে জাদুঘরকে যুগিয়েছেন সমৃদ্ধি, আর তাই তো সেগুন বাগিচার সেই সাবেকী দোতলা ভবনে উদ্বোধনের পর থেকে জাদুঘরকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি, কেবলি সামনে এগিয়ে চলা, চরৈবেতি আদর্শের উজ্জ্বল উপাখ্যান বুঝি এই প্রতিষ্ঠান।

সেগুন বাগিচায় সেই যাত্রাকালের পর পথ-পরিক্রমণে জাদুঘর এসে ঠাঁই নিয়েছে আগারগাঁওয়ের বিশাল স্থায়ী ভবনে। প্রকৌশলী ট্রাস্টি তারিক আলী হিসেব কষে বের করেছিলেন, পূর্বতন ভবনের চাইতে একশ' গুণ বেশি পরিসর রয়েছে এখানে। স্থপতি রবিউল হুসাইন পরম যত্নে সংস্কার কাজ করেছিলেন পুরনো ভবনের, দর্শকদের প্রস্থানের জন্য পেছনে যোগ করেছিলেন নান্দনিক এক ঘোরানো সিঁড়ি, নতুন জাদুঘরের নকশা প্রতিযোগিতামূলকভাবে হবে, এটা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আলী যাকের যখন রোগজর্জরিত, লড়াই করছেন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে, তারপরও জাদুঘর ভবনে এসে দাঁড়িয়েছেন কোনো কর্মসূচিতে, ভেতরের সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে। রজত-জয়ন্তীর শুভক্ষণে তাঁরা আমাদের মধ্যে নেই, এই বেদনা মিশে থাকে আনন্দ আয়োজনে।

আরো মনে পড়ে কত মুখ কত স্মৃতি। হাসান আলী বিশালদেহী শিল্পী, অবসর

সাইদুর রহমান

নিয়েছেন বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে, অবসরটুকু জাদুঘরের কাজে নিবেদনের প্রস্তাব নিয়ে হাজির, প্রস্তাব না বলে দাবি বলাই সঙ্গত। রণজিত কুমার পদবীহীন মানব হিসেবে নিজেকে গণ্য করেন, অনেক দিক দিয়ে বোহেমিয়ান, নিজের প্রতি পরম উদাসীন, কিন্তু ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে দেশের দূর-দূরান্তে পৌঁছতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। কেবল যে পরিভ্রমণে অক্লান্ত তা নয়, নিজেকে তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের কাছে পৌঁছতে, তাদের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহ এবং মুক্তিযুদ্ধের আরো নানা তথ্য উদঘাটনে। রণজিত চলে গেছেন বড় আকস্মিকভাবে, আমাদের জন্য সর্ব অর্থে ক্ষত ও ক্ষতি সাধন করে। আরেক অসাধারণ সাত্ত্বিক মানুষ, লোকসংস্কৃতির পরম গুণী সাধক মোহাম্মদ সাইদুরও স্বপ্রণোদিতভাবে এলেন জাদুঘরের কাছে, বাংলা একাডেমীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পরপর। তাঁর প্রস্তাবও ছিল অভিনব, তিনি লোকসংস্কৃতি গবেষণায় মাঠপর্যায়ের গবেষণা ও তথ্য আহরণে অনন্য ব্যক্তিত্ব, দেশে-বিদেশে তাঁর অবদান স্বীকৃত। তিনি চাইলেন এবার তিনি চারণের মতো

হাসান আহমেদ

ঘুরে বেড়াবেন দেশময়, জাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করবেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্মারক। তাঁর এই কাজের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে কী বিশাল সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে সেটা বলে বোঝানো দুষ্কর। ইউনেস্কোর ভাষায় কেবল মূর্ত ঐতিহ্য বা Tangible Heritage নয়, অমূর্ত ঐতিহ্যের সঙ্গেও তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্পৃক্তি গড়ে তুলেছিলেন। একাত্তরের লোকশিল্পীদের কতজন যে গান করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মঞ্চে, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে লোকশিল্পীর ভূমিকার পরিচয় দাখিল করেছেন, সে-হিসাব কষাও কঠিন।

কতভাবে কত মানুষের কথাই না মনে পড়ে! ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানকালে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন আনোয়ারা বেগম, স্বল্পবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ। তাঁর স্বামী বাঁধাই-করা প্রতিকৃতি তুলে দিয়েছিলেন ট্রাস্টি আক্কু চৌধুরীর হাতে, সেই পোর্ট্রেট স্থান পেয়েছিল জাদুঘরের গ্যালারিতে। মাঝে মধ্যে সেগুন বাগিচার জাদুঘরে আসতেন তিনি, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রতিকৃতির সামনে, স্ত্রীর আত্মদানের স্বীকৃতি তিনি এতদিনে খুঁজে পেয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম খানের শিশুকন্যা রেহানার জামা তো

রনজিত কুমার

জাদুঘরের আলোড়নময় স্মৃতিস্মারক, যা বিশ্বের অন্যান্য মিউজিয়মের ব্যতিক্রমী মানবিক স্মৃতিচিহ্নের সঙ্গে তুলনীয়। খুলনা থেকে আবদুস সালাম খান ছুটে আসতেন জাদুঘরে, দূর থেকে দেখতেন কন্যার স্মারক, আর দেখতেন জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের, বিশেষভাবে রেহানার জামার সামনে দাঁড়ানো নবীন-নবীনাদের। তাঁর এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে যে জাদুঘর কর্মীদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সালাম খানের প্রয়াণের পরও সে-সম্পর্ক অটুট রয়েছে তা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভিন্নতাই তুলে ধরে।

এমনভাবে পরম্পরায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজের ধারাবাহিকতা। ট্রাস্টিরা এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন, তবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সত্যিকার অর্থেই জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনগণের সহায়তাপুষ্ট সর্বজনের প্রতিষ্ঠান। আজ তাই অগণিত মানুষের কাছে আমরা আনত হই কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় যারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ধারণ করে আছে যাঁদের অবদান, সেইসব প্রয়াতজনের স্মৃতির প্রতি জানাই অশেষ শ্রদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে ২৫ বছর

অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন

ডিন, কলা অনুষদ এবং পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

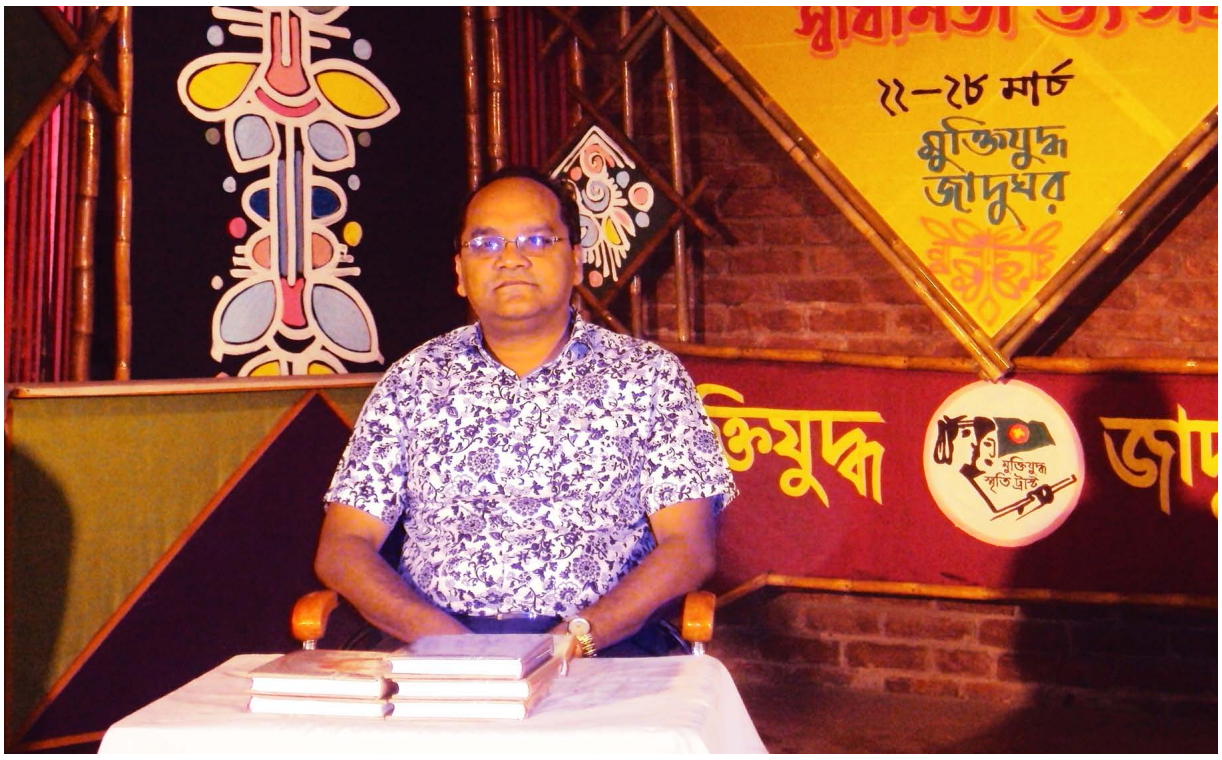

১৯৯৬ সাল। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপিত হলো। আশ্রয় হলো সেগুনবাগিচা, ভাড়া বাসায়। ভাগ্যক্রমে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও নান্দনিক একটি বাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। জাদুঘর প্রতিষ্ঠার আগে পত্রিকা মারফত জানাজানি হয়েছিল। তবে বেসরকারি পর্যায়ে জাদুঘর তাও আবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তা নিয়ে মানুষের সংশয়ের শেখ ছিল না। বিশেষ করে এর আয়ূকাল নিয়ে অনেকেকের সন্দেহ ছিল। বাঙালি যৌথ কারবারে বেশিদিন টিকে থাকে না। বেসরকারি যৌথ উদ্যোগও অনেকাংশে বেশি দিল স্থায়ী হয় না। আমার আগ্রহের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ হওয়ায় আমি চোখ কান খোলা রেখেছিলাম। জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি এবং উদ্যোক্তা মফিদুল ভাইয়ের সঙ্গে '৯০-এর দশকের শুরু থেকেই পরিচয়। তাঁর সাহিত্য প্রকাশ থেকে ইতোমধ্যে আমার সম্পাদনায় মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিয়াস ৩ খণ্ডে প্রকাশ ছাড়াও আমার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখির তিনি বড় পৃষ্ঠপোষক। আমি ঐ সময় আজকের কাগজে 'মুক্তিযুদ্ধ', জনকণ্ঠে 'বাংলার মাটি দুর্জয় খাঁটি', ভোরের কাগজে 'জ্বলো একাত্তর' নামে মুক্তিযুদ্ধের পাতা সম্পাদনার সুবাদে কিঞ্চিত তৃণমূল পর্যায়ে পরিচিত। এসব পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ পাতায় বহু নবীণ-প্রবীণ লেখকের লেখার কারণে একটি লেখক ও পাঠক শ্রেণিও স্বাক্ষী হয়েছিল। আমার সঙ্গে এতে বহু লোকের যোগাযোগ ছিল।

১৯৯৬ সালে ২২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সাদামাটাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোন রকমে গ্যালারি সাজানো হয়েছিল। মফিদুল ভাইয়ের আহ্বানে নিয়মিত যেতে শুরু করি, ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সদস্য স্বনামখ্যাত। কেউ নাটক, কেউ সংস্কৃতি জগতের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি। আমি একজন কনিষ্ঠ মানুষ যার শিক্ষকতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেগে থাকা ছাড়া কোনো ব্যস্ততা নেই। তাঁরা আমাকে কোনো কোনো সভায় আমন্ত্রণ জানাতেন। ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো কোনো সভায়ও বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত হতাম। পত্রিকা ও মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার কারণে আমার যে যোগাযোগ তা কাজে লাগানোয় তাঁরা পরামর্শ দিলেন।

একদিন মফিদুল ভাই জানালেন, তাঁরা আমাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একটি পদ দিতে চান। শেষ পর্যন্ত আমাকে পরিচালক (গবেষণা) পদ দিলেন। নিয়োগপত্র ও বেতনহীন এ চাকরি মন্দ লাগলো না। রাজী হয়ে গেলাম। একটি চিঠি তৈরি করে আমার নাম, পদবি ও স্বাক্ষরসহ দেশব্যাপী প্রায় ৩০০/৪০০টি পাঠানো হলো। বিভিন্ন পত্রিকার স্থানীয় সাংবাদিক, শিক্ষক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে তা পাঠানো হলো। মাসখানেকের মধ্যে কিছু কিছু জবাব ও উপকরণ আসতে শুরু করলো। সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনীতে কিছু টানানো হলো, কিছু সংরক্ষণ করা হলো। তখন বিভিন্ন জেলায় বিজয় মেলা, বিজয় উৎসবের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। আমরা স্থানীয় প্রকাশনা '৭১-এর লিফলেট, স্বাধীনতা পরবর্তী কিছু কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মরণিকা পেয়ে যাই। আমার সম্পাদনায় মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জির গ্রাম মূলধারা ১৯৯০ সালে প্রকাশ করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরো বৃহত্তর পরিসরে ২০০৪ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪ সালে তৃতীয় সংস্করণ এবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৪র্থ সংস্করণ বের করছে।

সেই শুরু থেকে এভাবে জাদুঘরে জড়িয়ে আছি। এখন জাদুঘর অনেক বড় হয়েছে। পেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া, বড় পরিসর। প্রথম দিন যেদিন আগারগাঁওয়ে নতুন জাদুঘরে গিয়েছি গর্বে বুক ভরে গিয়েছে। ২৫ বছরের জাদুঘরের এখন পূর্ণ যৌবণকাল। কোনো অনুষ্ঠান ছোট থেকে বড় হোক, জানতে পারলে সেগুনবাগিচায় উপস্থিত হতাম। কখনো কখনো কোর্সের বক্তা, অতিথি, দর্শক আর সেদিকে গেলে আড্ডা দিতে। মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব ভাইয়ের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল বাড়তি বোনাস। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে যৌথভাবে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতিতে মফিদুল ভাই, তারেক ভাই, ডা. সারওয়ার ভাই, মাহবুব ভাই, মামুন সিদ্দিকী, কামালসহ কতদিন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে গিয়েছি। যে দিন প্রথম গেজেট বের হলো আমাদের সামাজিক সহায়তা উদ্যোগের তালিকাভূক্ত প্রায় ৮০ জনের মধ্যে সিংহভাগ গেজেটভূক্ত হলো। আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে আমি ও তাররেক ভাই যোগ দিয়েছিলাম। রবিউল ভাইয়ের সঙ্গে গল্প শুরু হলো বয়স কোনো বাধা হতো না। যাদের সঙ্গে ২৫ বছর আগে স্বাক্ষাৎ হতো তাদের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের কারো কারো সঙ্গে আর কখনোই দেখা হবে না। তবে জাদুঘরের সঙ্গে সেতুবন্ধন রচনায় রেজিনা এখনো লেগে আছে। কখনো খুদে বার্তা আবার কখনো ফোনে রেজিনা সংযুক্ত থাকে। ওর কাছে ফাঁকি দেয়া খুব কঠিন। আর মফিদুল ভাই, যিনি জাদুঘর ছাড়াও আমাকে অন্য প্রতিষ্ঠানের কোনো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাজে ফাঁসিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত।

জাদুঘরের পরিচালক (গবেষণা) পদে নিয়োগের কোনো সময়সীমা ও চিঠি আনুষ্ঠানিকভাবে পাইন। ২৫ বছরে পূর্ণ পেনসনের নিয়ম সরকারি খাতায় আছে। আমার পেশন সিংবা বরখাস্ত, কিংবা অবসর কোনোটি হয়নি। তবে বিনা বেতনের চাকরি যে নেই সেটা নিশ্চিত। কারণ এখন জাদুঘর শুধু দেশে নয় বিদেশে বহুল পরিচিত। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ নমুনা দেয়। তাই পরিচালক হিসেবে আমার চিঠি দেওয়ার প্রয়োজনও পড়ে না। কিন্তু পদে না থাকলেও আমি জাদুঘরের সঙ্গে আছি, থাকবো, আমৃত্যু। পরিচালক নয়, কর্মী হিসেবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যুগযুগ ধরে টিকে থাকুক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দীর্ঘজীবী হোক এ কামনা।

স্মৃতিতে, ভালোবাসায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমার আত্মপরিচয়ের স্মারক বহনকারী প্রতিষ্ঠান। অনুভবে, অস্তিত্বে মিশে থাকা সত্তা। আমরা ক'জন বন্ধু কী এক আকর্ষণে, ভালোলাগায় জাদুঘরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। সময়টা ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি। জাদুঘরের ঠিকানা তখন ৫, সেগুনচাগিচায়। কিছু স্বেচ্ছাসেবী নেওয়া হবে জাদুঘরে কাজের জন্য, খবরটা দেয় বন্ধু শিফা। কালবিলম্ব না করে হাতে লেখা জীবনবৃন্তান্ত নিয়ে শ্রদ্ধেয় আক্কু ভাইয়ের সামনে হাজির হলাম। চিরাচরিত নিয়মে লেখা জীববৃত্তান্তের একটা জায়গায় 'ধর্ম' পরিচয় লেখা ছিল। আক্কু ভাই একটানে কেঁটে দিয়ে বলেছিলেন, কাজের জন্য religion is not importent প্রথম দিনের এ ঘটনায় অসাধারণ অনুভূতি হয়েছিল, আমার নিজের ভাবনার সাথে মিল হওয়ায়।

প্রথম দিনের অভিভূত করা ঘটনা দিয়ে শুরু। আমরা যারা কর্মী ছিলাম, কারও কাজের প্রতি ভালোবাসার কমতি ছিল না। শ্রদ্ধেয় ট্রাস্টিবৃন্দের বন্ধুসুলভ ব্যবহার ভুলবার নয়। কাজের জন্য কখনও তাঁরা অধঃস্তন মনে করে নির্দেশ দিতেন না। তাঁদের আচরণে 'আমরা সকলে জাদুঘরের কর্মী'র প্রতিফলন থাকত। মাসের একটা রবিবার ছিল জাদুঘরের গ্যালারি, অফিস কক্ষ পরিচ্ছন্নতার কাজ। আমরা সকলে মিলে পরম উৎসাহে, ভালোবাসায় সে কাজ সম্পন্ন করতাম। কাজগুলোর মধ্য দিয়ে নিমিষেই যেন পৌঁছে যেতাম মুক্তিযুদ্ধের সময়ে। কাজের প্রতি আমেনা আপার নিষ্ঠা, একাগ্রতা ছিল তুলনাহীন, যা এখনও সমানভাবে বিদ্যমান। কাজকে ভালোবাসতে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। কাজের ধরনভেদে অর্থাৎ, ছোটকাজ, বড়কাজের বিভাজনে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ না করার মানসিকতা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রদ্ধেয় ট্রাস্টিবৃন্দের কাছ থেকে পাওয়া, যা আজও বহন করে চলছি। সেগুনবাগিচার ছোট্ট পরিসরে বৃহৎ, মহান মুক্তিযুদ্ধকে কতটা যত্নে, ভালোবাসায় আগলে রাখা যায়, ট্রাস্টিবৃন্দের প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল সেটাই। মাঝেমাঝে মন খারাপ করত, জাদুঘরের যদি একটা বড় জায়গা হত! আজ জাদুঘর বড় জায়গা পেয়েছে, পরম প্রশান্তি তা। কাজ করতে করতে একটা সময় আমার উপর দায়িত্ব পড়ে মিরপুর এলাকার একটি বধ্যভূমি 'জল্লাদখানা' অনুসন্ধানকরণের। নাম শুনে বুকের ভেতর বেদনায় দুমড়ে-মুচড়ে উঠেছিল! কাজ শুরু হলো স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মধ্যদিয়ে, যাঁদের মধ্যে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন বালক বাবলু ভাই, যিনি জল্লাদখানা মৃত্যুপুরী থেকে অতি কষ্টে প্রাণে বেঁচে ফিরেছিলেন। বধ্যভূমি নির্দিষ্টকরণের পর খননকার্য শুরু হলো সেনাবাহিনীর সহযোগিতায়, সর্বক্ষণ মনে হতো স্বজন খুঁজে ফিরছি। আসলে মানুষের সে কঙ্কালগুলো তো আমার স্বজনই, যাঁরা একটি স্বাধীন দেশ দিয়েছে। জল্লাদখানায় শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ হয়েছে। মাঝেমাঝে ভাবি আমরা কতটুকুই বা দিতে পেরেছি তাঁদের, যাঁরা একটি স্বাধীন দেশ দিয়েছে! শুধু চিরঋণী হয়ে থাকা ছাড়া কীই বা দিতে পারি!

জাদুঘরের উদ্যোগে একটি স্মরণীয় অসাধারণ প্রোগ্রাম ছিল আউটরিচ প্রোগ্রাম, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জাদুঘর পরিদর্শন করানো এবং তাৎক্ষণিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ। ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছ্বাস থাকতো চোখে পড়ার মতো, মুক্তিযুদ্ধকে জানবার সে কী একাগ্রতা! এরকম একটি কাজের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাদুঘর পরিদর্শনে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সান্নিধ্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভিন্ন সময়ে জাদুঘর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিল্পীবৃন্দের সান্নিধ্য আজও অনুভবে বিদ্যমান। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনে শিউরে উঠতাম। তাঁদের কাজের মধ্যে, আমাদের মধ্যে তাঁরা বেঁচে থাকবেন, এ চিরসত্য।

সহকর্মী বন্ধু সকলকে খুব অনুভব করি। আমরা সকলে ছিলাম একটা পরিবার। ছোট্ট দর্শনার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে নাসির ভাই পাকিস্তানি পণ্য বর্জন করতে বলতে ভুলতেন না। কত স্মৃতি জাদুঘরের সাথে! জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় আমার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কাটানো দিনগুলো। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পাথেয় হয়ে থাকবে। সকল মুক্তিযোদ্ধাকে কুর্নিশ।

নিবেদিতা হালদার

বারে বারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আঙিনায়

‘শিখা চিরন্তন’ চত্বরে আমার মেয়েরা গাইছে। কিছু আগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন শেষে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে, লাল-সবুজ ক্যাপ মাথায় বিজয়ীদের হাতে বই-ওদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস- আমার মোবাইল ক্যামেরায় বন্দী হতে থাকে। অপার আনন্দে আমি ভুলে যাই- আমার হলুদ পরীদের উপর গজিয়ে ওঠা অভিমান। ওরা জাদুঘর পরিদর্শনের সময় সেলফিতে মেতেছিল প্রায় সারাক্ষণ- পঁচিশ মার্চের কালো রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে শহীদ ড. ফজলে রাব্বির গাড়িতে হেলান দিয়ে ছবি, নানা স্মারকের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি, নৌকার গলুইয়ে, ঘরের জানালায় কখনো নিজ নিজ এলাকার স্মারকের পাশে- এমন কি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল দিনগুলোর অমন আর্তনাদের দৃশ্যেও ওদের হাসি হাসি মুখে ছবি তুলবার ভঙ্গি দেখে আমরা আহত হচ্ছিলাম। এক গ্যালারি থেকে আরেক গ্যালারিতে নিতে কৌশলে তাড়া দিতে দিতে দু’ একবার ধমক দিয়েছি- একথা লুকাই কী করে। সেই চঞ্চল মেয়েগুলো কী গভীর শান্ত মুখে চোখ বুজে প্রাণ খুলে গাইছে- ধনধান্য, পুষ্প ভরা...। এ আনন্দ প্রকাশ সহজ নয়। বলছি ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ এর কথা। আমার বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রীদের নিয়ে করোনা উপেক্ষা করে নিজেদের এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রীতি মেনে ৩ ঘণ্টা কাটিয়েছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে। সহকর্মী উম্মে সুরাইয়া, নুরুজ্জামান সিকদার, আসমা খানম মেয়েদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন বোর্ডে যেসব লেখা আছে সেগুলোরও ছবি তোলো। অবসরে দেখো। ঠিকই তো। ওরা স্ক্রিনে দেখবে যে যার সময় মত। ডিজিটাল যুগের পূর্ণ ব্যবহার ওরাই তো করবে। আশ্বস্ত হই। এখন না দেখুক ঠিকমত ছবিগুলো থাকলে কোন না কোন সময় দৃষ্টি থেকে অনুভবের ফ্রেমে বাঁধা পড়বে এমন আশা জাগে ওদের নিয়ে। এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমরা প্রতিবছর নতুন মানুষের সাথে ভরে উঠি বারবার নতুন বিষণ্নতায়, গভীর বেদনাবোধ, চিরবিস্ময় আর স্বাধীন পতাকার তলে নিজেদের আবাসভূমির কথা ভেবে। শিক্ষার্থীদের প্রতিবছরই জাগিয়ে তুলি পুরাতন অভিজ্ঞতার কথা বলে নতুন অভিজ্ঞতায় ভরে ওঠার অপেক্ষায়।

সেগুনবাগিচার সেই ছায়া সুনিবিড় ছোট্ট বাড়িটায় স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতাম ভাবতাম এত বড় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মাত্র ক’জন মহৎ প্রাণের প্রাণান্ত চেষ্টায় পল্লবিত হচ্ছে ? বড় হতে পারে না! হয়েছে। আরো হবে। সেই ছোট্ট উঠানের এক কোণে চমৎকার একটি মঞ্চে আমাদের শিক্ষার্থীদের নাচ, গান, আবৃত্তি-বক্তৃতার ভেতর দিয়ে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি তারই ফল তো আজকের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। অনুষ্ঠানগুলোর ফাঁকে মেয়েদের পরিচয় করাতাম, তারেক ভাই, আলী যাকের, মফিদুল ভাই, নূর ভাই, সারোয়ার ভাই, মাহবুব ভাইদের সাথে। এমন কর্মবীরদের প্রত্যক্ষ দর্শনে আমরা আপ্লুত হতাম। রনিকা আপা, রফিক ভাইসহ অন্যরাও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লিফলেট, বইপত্র, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত গল্পের সংকলন সরবরাহ করতেন। এমন প্রাণের আহ্বান শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদেরও বারবার অনুপ্রেরণা দেয়। বলছি এসব নিজের মত। বিশ্বাস করি যারা এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নেন সবারই এমন অনুভব নাড়া দেয় বারবার। না হলে কেন আমরা ফিরে ফিরে আসি। মনে পড়ছে ২০১০ সালে মুক্তির উৎসবের কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে মুক্তির উৎসবে আমাদের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের কথা। ৫২ জনের ১টি দল ১৮ মিনিটে উপস্থাপন করেছিল বাংলার ২০০ বছরের ইতিহাস। উত্তরের গীতিকবি মহেশ চন্দ্র রায়ের লেখা ৩ পৃষ্ঠার ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি গীতিনকশা ‘সোনার বাংলা’ প্রাণ পেয়েছিল আমাদের শিক্ষার্থীদের নাচ-গান- আবৃত্তির অপূর্ব সমন্বয়ে। সে সময় অভিভাবকগণ প্রায় একমাস ধরে বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা অবধি বসে দেখতেন সন্তানদের মহড়া। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, পরিচালনা পরিষদ সমন্বিতভাবে সরবরাহ করেছিলেন প্রয়োজনীয় পোশাক, নাচের কসটিউম, নাস্তা ইত্যাদি। করোনা পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যেভাবে তাদের কর্মকাণ্ড চালায় ‘মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা’ হাতে না পেলে বোঝানো যেতো না। সেমিনারে রাখি এ সব প্রকাশনা। মেয়েরা পরিদর্শন শেষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে যে সব পুরস্কার পায় কেউ কেউ দান করে যায় সেমিনারে বা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পাঠাগারে। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পৌঁছায় ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে সারাদেশে।

ড. জেসমিন বুলি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মিরপুর গার্লস আইডিয়াল কলেজ

আমাদের গর্ব ও ভালোবাসার অপর নাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ডিসেম্বর ২০০৮ এ যে দিন প্রথম সেগুন বাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাই সেদিন সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের একটি অনুষ্ঠান ‘চ্যানেল আই’ সরাসরি সম্প্রচার করছিল। ভিষণ ভিড়, নিরাপত্তা বেষ্টনি পেরিয়ে যখন জানালাম আমি শিক্ষকতা করি এবং প্রোগ্রাম অফিসার রনিকা ইসলামের সাথে দেখা করতে চাই, তখন গ্যালারিতে অবস্থানকারী জাদুঘরের এক কর্মী গ্যালারির ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলেন কাঙ্খিত ব্যক্তির কাছে। সেই প্রথম এবং শেষবার আমি সেগুনবাগিচার জাদুঘরে জুতা পায়ে হেঁটেছিলাম। তারপর যতবার জাদুঘরে গিয়েছি সবসময় খালি পায়ে গ্যালারি, জাদুঘরের প্রাঙ্গণ, মঞ্চের ধূলো মেখেছি ভালোবেসে। জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী, নেটওয়ার্ক শিক্ষক কিংবা উদ্যোক্তা সদস্য যে পরিচয়েই যাই না কেন সর্বদা উষ্ণ ভালোবাসা পাই। সেই সাথে আব্বুকে সাথে নিয়ে জাদুঘর দেখতে না পারার একটা আক্ষেপ কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বলে আব্বুর আমৃত্যু আক্ষেপ ছিল। ১৯৭১ এ মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করা, অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, ঢাকা থেকে পলায়ণরত মানুষকে আশ্রয়দান ইত্যাদি গল্প আব্বুর মুখে শুনে শুনে ছোটবেলা থেকে মনে মুক্তিযুদ্ধের যে ছবি গাঁথা হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক, ছবি, শরণার্থী শিবিরের দৃশ্য দেখে তা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। শিক্ষক হিসেবে

চাকুরীতে যোগদানের ঠিক আগেই আব্বু চলে গেলেন না ফেরার দেশে। যে দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক স্যারের হাতে নিজের বেতন থেকে জমানো টাকা তুলে দিয়েছিলাম উদ্যোক্তা সদস্য হিসেবে, সেদিন আব্বার জন্য আমার উপার্জনের কোন টাকা খরচ করতে না পারার কষ্ট লাঘব হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিদের বিশেষ করে মফিদুল স্যার, সারোয়ার স্যার, তারিক স্যার এর স্নেহের ধারায় সিক্ত হয়েছি বারবার। জাদুঘরের সকলের ভালোবাসা, সহযোগিতা পেয়েছি আউটরিচ প্রোগ্রামে, মুক্তির উৎসবে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যতবার গিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যে চেতনা তৈরি হয় তা আমাকে আপ্লুত করে। সেই সাথে ওদের চোখে দেখি আমার জন্য শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। গভীর একটা অনুভূতি কাজ করে তখন এই ভেবে যে, আমি আমার আব্বুর মেয়ে। আব্বু চেতনার বীজ বুনে না দিলে, বিকশিত হওয়ার সুযোগ না দিলে এই আমি মুক্তিযুদ্ধকে এভাবে জানার চেষ্টা করতাম কিনা জানি না। যখন শিক্ষার্থীদের সাথে আউটরিচ প্রোগ্রামে জাদুঘরে আসি, কুইজ শেষে শিক্ষার্থীরা পুরস্কার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন বই গ্রহণ করে তখন আব্বু আমাকে মুক্তিযুদ্ধের বইগুলো দেয়ার পর যে আনন্দ পেতাম তাই যেন প্রতিবার ফিরে ফিরে আসে। নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছি বেশ কয়েকবার, পরিচিত হয়েছি সারা দেশের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সাথে। তাদের চিন্তাধারা, কর্মপন্থার সাথে নিজেরটা মিলিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। জাদুঘরের কাছে আমার ঋণ অনেক। মফিদুল স্যারের মত একজন অভিভাবক পেয়েছি জাদুঘরে কাজ করার মধ্য দিয়ে। ২০১৪ সালে গাজীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম লতিফপুরের বীরঙ্গনা মমতাজ খালা যখন অর্থের অভাবে, সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে চিকিৎসা না পেয়ে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করছিলেন তখন সে খবর মফিদুল স্যারের কাছে জানানো মাত্রই স্যার আশ্বাস দিলেন সর্বাত্মক সহযোগিতার। স্যার কথা রেখেছিলেন। মমতাজ খালা মৃত্যুর আগে যথাযথ চিকিৎসা পেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমৃত্যু তাঁর পাশে থেকেছে। বীরাঙ্গনা হিসেবে মমতাজ খালার স্বীকৃতি প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে জাদুঘরের প্রচেষ্টায়। ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক-এর পড়া শেষে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগও করে দিয়েছে আমাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একদল মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী উদ্যমী তরুণদের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে জাদুঘরের CSGJ এর গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে।

আমার যখন খুব মন ভালো থাকে কিংবা খুব মন খারাপ হয় তখন আমি দু’টো জায়গায় যাই। এক আমার আব্বুর কবর আর দুই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। আমি গর্বিত জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে। আমাদের গর্ব আর অহংকার এর অপর নাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

শারমীন স্বাতী

বাঙালির ঠিকানা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি বা দেখলেও বোঝার বয়স ছিল না তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি ঠিক কেমন তা বোঝাতে পারবো না। তবে যে দিন প্রথম ৫ নম্বর সেগুনবাগিচার সেই বাড়িটিতে পা রেখেছিলাম – মনে হচ্ছিল কেউ যেন অপেক্ষা করছে, একান্ত নিজের। প্রবেশ পথেই শিখা 'চির অম্লান' আগুনের পরশমণি বুকে টেনে নিয়েছিল সন্তানের মতোই। অঙ্গিকার মা মাটির কাছে। সাক্ষী বাংলার রক্ত ভেজা মাটি, সাক্ষী আকাশের চন্দ্র-তারা, ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি, ভুলবে না কিছুই আমরা। স্মৃতির তাড়নায় বুক ভারি হয়ে ওঠে।

সে আজ প্রায় একুশ বছর হলো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর মামাকে যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী হয়ে গিয়েছিলেন ভারতে। পথেই হারিয়ে ছিলেন মা-বাবাকে, বোন ও স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেননি হায়নাদের হাত থেকে। আড়াই বছরের কন্যা সন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে সেই দুর্যোগের দিনে কোথা থেকে যে কোথায় কতদূরে গেছেন সে সব মনে পড়লে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে উঠেন। যখন ফিরেছেন স্বাধীন জন্মভূমিতে ততদিনে আগুনে পোড়া ঘর-বাড়ি, জমি-জিরাত বেদখল। উদবাস্তু তিনি খালি হাতে ফিরে গেছেন আবার নিরুদ্দেশে। সে সব দিন তার কাছে চিরস্থায়ী দুঃস্বপ্ন।

সেই তিনিই এতো দিন পর এসেছেন কিছু স্মৃতির টানে যা তাঁকে কোথাও স্থির হতে দেয় না।

সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা। স্বল্প আলোয় কোথায় যেন একটা বিচ্ছেদের হাওয়া শিরশির করে ওঠে। মামাকে নিয়ে দোতলার সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিলাম। সেই শব্দে পুরোনো দোতলা বাড়িটিকে ঘিরে তার থেকেও প্রাচীন কিছু গাছপালা, সেখানে আশ্রয় নেয়া পাখ-পাখালির চঞ্চলতা, কলোকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠা – যেন স্থিমিত শোক থেকে জেগে ওঠা বাড়ি। তিনি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছিলেন আর পা টেনে টেনে এঘর থেকে ওঘরে খুঁজে ফিরছিলেন রক্তে ভেজা শহীদের স্মৃতিচিহ্নের ভিতর নিজের কিছু চেনা স্মৃতি। তিনি জানতেন তাঁর পরিবারের কোন স্মৃতিচিহ্ন এখানে নেই তবু যা দেখছেন অনুভব করছেন নিজের বলে। দেয়ালে টানানো রক্তে ভেজা শিশুর ছোট্ট জামাটির কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন হতবিহ্বল। সে দিন যে শিশুটিকে বুকে চেপে ছুটে বেড়িয়েছেন পাগলের মতো তাকে তিনি বাঁচাতে পারেননি। না তিনি কোন কথা বলেননি কেবল তাঁর পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ঘরটাকে বেদনায় আরো ভারি করে তোলে। সে স্মৃতি আমি আজো ভুলতে পারি না।

একটি ঠিকানা খুঁজে পেতে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মণিমুক্ত তুলে এনে গুছিয়ে রাখতে শুরু করে ছিলেন যাঁরা তাদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। তাঁরা প্রত্যেকেই মহান '৭১ এর রণাঙ্গণের সৈনিক। যেন এক অখণ্ড বাংলাদেশ, জেগে আছে মাথা তুলে। ইতিহাসকে হারিয়ে যাওয়ার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার তাগিদেই সে সময়ের পথের নুড়িকেও পরম যত্নে তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের স্মারক হিসেবে। কী নির্মোহ চেতনায় ইতিহাসের চিহ্ন - যেখানে যতটুকু পেয়েছেন ভালবেসে আঁকড়ে ধরার আকুলতা। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি – এই বোধ থেকেই তো সেই যুদ্ধের পতাকা তাঁরা তুলে দিতে চান নতুন প্রজন্মের হাতে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তো সে জন্যেই। বাঙালির ঐতিহ্যের পরিচয় থেকে শুরু করে বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস, প্রতিরোধ যুদ্ধ, বুদ্ধিজীবী হত্যা, গৌরবময় বিজয়ের ইতিহাস। ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছে করে এমনভাবে যাতে হৃদপিণ্ডের রক্ত সজাগ হয়ে ওঠে। তাই এ ঘর আমাদের চেতনা জাগানিয়া জিয়োনকাঠি।

জয় হোক চেতনাময় নতুন প্রজন্মের।
জয় হোক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের।

হেনা সুলতানা
শিক্ষক, ভারতেশ্বরী হোমস্, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

লিফলেট চিঠি

আমি তখন সবেমাত্র মাষ্টার্স করছি। এমফিল এ ভর্তি হবো। সামনে আমার একটাই উচ্চাশা পিএইচডি করবো। তখন ক্লাশ থাকে সপ্তাহে মাত্র দুটো। ভাবলাম, অলস সময় যাচ্ছে, পাশাপাশি একটা কিছু করা দরকার। তখন তো আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছিল না, তাছাড়া আবৃত্তির মহড়াগুলো সেই সন্ধ্যায় হয়। আবৃত্তি করার সুবাদে হাসান আরিফ ভাইকে চিনি, আসাদুজ্জামান নূর ভাইকেও। এদের দুজনকেই বললাম, আমার এখন একটা চাকরি দরকার, বেকার সময় কাটাচ্ছি। নূর ভাই বললেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসো, দেখি কি করা যায়। নিজের উপর বিশ্বাস ছিল বলেই যাওয়ার পরে ইন্টারভিউ দেওয়া মাত্রই চাকরিটা কনফার্ম হয়ে গেল। এটা ঠিক চাকরি নয়। বেতনের জন্য বুভুক্ষু থ াকতাম না আমরা। একঝাঁক টগবগে তরুণ যোগ দিল জাদুঘরে। কী জাদুর টানে সবাই মশগুল তখন যে, জাদুঘরের যে বিভাগেই পারছি বা ডাকছে, সেখানেই কাজ করতে ছুটে যাচ্ছি। দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই এমনকি আমাদের কারো কোন অভিজ্ঞতাও নেই। তবুও কাজ করেই যাচ্ছি। আমার রুমমেট মনিকাকেও টেনে নিয়ে এলাম এখানে। সবাই একসাথে একহাতে কাজ না করলে যে ভালো লাগছিল না। আমেনা, বিউটি, মনি, নিবেদিতা, কাজল দা, রফিক ভাই, টনি, সোহাগ আরো কত তাজা প্রাণের মিলনমেলা হয়ে উঠলো আমাদের জাদুঘর। হুম, এটা আমাদেরই জাদুঘর। এখনো মনেপ্রাণে তাই-ই বিশ্বাস করি।

আমার জীবনের আরেক অধ্যায়ের সাথেও জাদুঘর জড়িয়ে আছে। কাজের টানে ছুটতে ছুটতেই খুঁজে পেলাম সেই মানুষটিকে যে আজ পর্যন্ত আমার হাত ধরে আছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কখনো ৪ নম্বর বা কখনো ৫ নম্বর গ্যালারিতে ডিউটি পড়ে আমার। সোহাগও তখন ঐ অফিসেই চাকরি করে, কিছু একটা করতে হবে তাই। ও তখন টিকেট কাউন্টারে প্রতিটি টিকেটের সাথে একটা করে লিফলেট দেয় দর্শকদের। আমি মেইন গ্যালারির ভিতরের দিকে থাকি। কখনো পানি খাওয়া বা চা খাওয়ার নাম করে সোহাগ কিচেনে ঘুরে আসে আর চিলের মত চারদিকে দৃষ্টি রাখে আমাকে কোথাও দেখে কি না। বিধিবাম। দেখা হয় না। তাই চিঠির আশ্রয় নেয়া। লিফলেটের পিছনটায় যতটুকু ধরে তার পুরোটা জুড়েই চিঠি। ওর প্রতিটি অক্ষর আমার কাছে মুক্তোর মত লাগে। তারপর সেটা ব্যাগের মধ্যে রেখে আমার লেখা চিঠিটা বের করে পত্রবাহক রশিদ ভাইকে খুঁজতে থাকি। বিড়ালের মত পা টিপে টিপে একবার এপাশের গ্যালারি পেরিয়ে ওপাশের বারান্দায় যাই। পত্রবাহক বুকষ্টলেই বসেন বেশি। আর খেয়াল রাখেন আমার ঐ বারান্দার দিকে। আমার চিঠিটা কেবলমাত্র ছুঁড়ে মারতে যাবো, ওমনি সে ইশারায় নিষেধ করে দৌড়ে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে আবার ভোঁ দৌড় দেয়। পত্রবাহক দারুণ তড়িৎকর্মা বটে।

আমার এই চিঠি লেখাতেও মাঝে মাঝে দর্শকদের বাঁকাচোখ বা বুড়ো হাবড়া ম্যানেজার শফি ভাইয়ের চশমা উঁচিয়ে দেখাকে উপেক্ষা করি। দেখুক। তবু চলে বন্ধন। হৃদয়ের বন্ধন। জাদুঘরে কাজ করতে গিয়েই শিখলাম বন্ধন, একতা, বিশ্বাস আর কাঁধে কাঁধ রাখা। জাদুঘর থেকেই আমার স্থায়ী ঘরের ঠিকানা জুটে গেল। তাই আমার ঘরের প্রতিটি সুখ-দুঃখে জাদুঘরের কথা উঠে আসে। ৮ জন ট্রাস্টির কথা উঠে আসে। আমার দেশের কথা উঠে আসে।

আক্তারী বেগম শিফা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে স্বেচ্ছাসেবার অভিজ্ঞতা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে আমার পরিচয় ২০০৮ সালে 'ওয়ার্কশপ অন পিস, টলারেন্স এন্ড প্লুরালিজম' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। কর্মশালাটিতে অংশগ্রহণের সময় জাদুঘরের কর্মকাণ্ড, পরিবেশ, কর্মরত সকলের ব্যবহার ও আন্তরিকতা এতটাই ভালো লেগে গেলো যে কর্মশালার পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দিলাম। গত প্রায় ১৩ বছর জাদুঘরের নানান রকম কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার এবং কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এখানে ডকুমেন্টেসনের কাজ করার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে দেশে বিদেশে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের খবরগুলো জেনেছি। এই সময়ে থেকে সেই সময়গুলো যেনো কাছে থেকে অনুধাবন করতে পেরেছি, এটা পরম পাওয়া।

ওরাল হিস্ট্রি সংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে শিখেছি কীভাবে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়। ঠিক যেন ছাইয়ের ভেতর থেকে রত্ন খুঁজে পাবার মতো। জাদুঘরের অনুষ্ঠানে নাটক করতে গিয়ে আমাদের বার বার মহড়া দিতে হতো। সবাই মিলে শিখেছি কেমন করে ধৈর্য ধরে নিজেদের কাজ ভালো থেকে আরো ভালো করা যায়। মুক্তির উৎসবে কাজ করতে গিয়ে আমাদের স্বাধীনতার চেতনায় একাত্ম হয়েছি শত-শত, হাজার-হাজার ছাত্রছাত্রীদের সাথে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজ শুধু একটি জায়গাতেই সীমাবদ্ধ নয়। জাদুঘরের কাজ করতে গিয়ে যেতে হয়েছে নানান জায়গায়। মোবাইল মিউজিয়ামের সাথে দেশের নানান প্রান্তের স্কুলে আমরা ঘুরেছি। ছাত্রছাত্রীদের জানিয়েছি দেশের ইতিহাস। ছোট ছোট কর্মশালার মাধ্যমে তাদের শিখিয়েছি শান্তি, সম্প্রীতি এবং নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে। জাদুঘর থেকে আমরা গিয়েছিলাম ভারতের শান্তিনিকেতনে এ ইয়ুথ ক্যাম্পেও। সেখানে শান্তিনিকেতনের অনন্য পরিবেশে আমাদের মতোই আরো বহু দেশ থেকে আগতদের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ হয়। আমরা নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করেছি কেমন করে পৃথিবীতে ন্যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেখানে আমাদের আরো পরিচয় হয় শান্তিনিকেতনের আশপাশে বসবাসরত আদিবাসীদের সংস্কৃতির সাথে। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গুণীজনদের বক্তৃতা, নিয়মিত মতবিনিময়, ও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীগুলো এখনো আমাকে সম্মৃদ্ধ করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির বহুমুখী কর্মকাণ্ড দেশের ইতিহাস রক্ষায় যেমন জরুরি, তেমনি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্বাধীনতা ও সুনীতির চেতনা বিস্তৃত করার জন্য প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানটি যেন সকল মানুষের। এখানে আমি প্রাণ খুঁজে পাই। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকান্ড যুগে যুগে আরো বিস্তৃত হোক, এই আমার কামনা।

সালমা সোনিয়া

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : আমাদের ক্রান্তিকালের প্রেরণা

মুক্তযুদ্ধ জাদুঘর মন ও চিন্তায় কাছাকাছি আটজন মানুষ গড়ে তুলেছেন। তাঁদের প্রত্যেককেই আমি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে চিনেছি ও জেনেছি। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে তাঁরা আমাদের প্রথম সারির মানুষ। আমি কিশোর উত্তীর্ণ সময়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হই সাংগঠনিক আবৃত্তির সূত্রে। ফলে তাঁদের নেতৃত্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন চলাকালেই ব্যাক্তিগত সান্নিধ্যে আসি। প্রত্যেকেই খুব স্নেহ করতেন। এরই মধ্যে '৯২ এ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলন শুরু হলো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গঠনের আটজন ট্রাস্টি তাঁরা প্রত্যেকেই সেই আন্দোলনের প্রথম সারিতে সক্রিয়। নানান ধরনের সৃজন-ভাবনা ও আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তাঁদের নির্দেশ মান্য করে আমরা তরুণরা সক্রিয় থাকি আন্দোলন সংগ্রামে। একদিন ডাক পড়লো ৫ নম্বর সেগুনবাগিচায়। কেন তা পরিস্কার নয়। সেই ভগ্ন বাড়ির দোতলার একটি ঘরে গিয়ে আটজনকেই দেখতে পেলাম। তারমধ্যে মফিদুল ভাই ও নূর ভাইর সঙ্গে বেশী দেখা হয়, অন্যদের সঙ্গে আন্দোলনের কর্মসূচিতে। তাঁরা আমাকে বিস্তারিত জানালেন এবং জাদুঘরের কর্মকাণ্ডে আগ্রহী তরুণ সংস্কৃতিকর্মীদের সম্পৃক্ত করতে বললেন। আমি পুরো বিষয়টা বুঝেছিলাম।

ইতোমধ্যে স্রোত আবৃত্তি সংসদের সঙ্গে শহীদদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান 'আমরা তোমাদের ভুলবোনা' নির্দেশনা ও গ্রন্থনার কাজ করেছি, প্রজন্ম '৭১ গঠন ও কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা করেছি। ফলে তরুণরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে কতটা আলোড়িত ও উদ্দীপ্ত হবে তা ধারনা করতে পারছিলাম। মনে পড়ে যেখানে যাদেরকেই বলি সব হৈহৈ করে ওঠে। ওদের চোখের মধ্যে আমি একটা নতুন স্বপ্ন দেখতে পাই। যা আমার হৃদয়েও আঁকা হয়ে গেছে। দলবেঁধে ছেলেমেয়েরা ৫ সেগুনবাগিচায় গিয়ে কতৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করেছে। আবৃত্তিশিল্পী রফিকুল ইসলাম, নাসির এই দু'জনকে গ্রামের বাড়ি থেকে খবর দিয়ে এনেছিলাম। আমেনা হাত ধরে অশ্রুসীক্ত চোখে বলেছিল 'আমি জাদুঘরে কাজ করতে চাই'। শহীদ সন্তান সোহাগ বলেছিল, কোন অর্থের প্রয়োজন নেই যতদিন পারবো কাজ করতে চাই। আরো কত প্রিয় মুখ সেই কাজে যোগ দিল।

২/৩টি শহীদ পরিবার মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রদানের সময় ট্রাস্টিদের সঙ্গে আমাকেও থাকতে বলেছিলেন। আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করায় বলে ছিলেন, 'আপনি আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে থাকবেন'। এমন স্মৃতি আজও একান্তে অশ্রুজলে আমার বুক ভেজায়। মুক্তিযাদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধনী দিনে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে মূলফটকের সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। জাতীয় সঙ্গীতের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনায় আমি শিহরিত হলাম। তারপর থেকে কারণে অকারণে ৫ সেগুনবাগিচা আমাদের প্রাণের ঠিকানা হয়ে উঠলো। প্রতি বছর বেশ কিছু জাতীয় দিবসে অংশগ্রহণ ছাড়াও কিছু বিশেষ ভাবনার কাজ করেছি মফিদুল ভাইয়ের পরামর্শে। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রান্তিক অঞ্চলের কেউ ঢাকায় এলে মুক্তিযাদ্ধ জাদুঘর কতৃপক্ষকে তা জানিয়েছি। ২০০১-২০০৬ এই সময়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গনে করেছি। পরিসর খুব একটা বড় না হলেও চেতনার গভীরতা অনুভূত হতো সবার হৃদয়ে। শিশুদের সংগৃহিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি- যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিয়মিত কার্যক্রম। মফিদুল ভাইয়ের অনুরোধে তা নিয়ে আমি স্রোত আবৃত্তি সংসদে একটি অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা ও নির্দেশনার কাজ করেছিলাম । প্রযোজনাটির নাম ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ রূপকথা নয়'। ভিন্নমাত্রায় মুক্তিযুদ্ধকে অনুধাবন করেছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মানুষের ভালোবাসা ও অর্থায়নে আজ বহুতল বিশিষ্ট ভবন। শৈল্পিক ও নান্দনিক ভাষায় মুক্তিযুদ্ধকেই মূর্ত করে তুলেছে। চোখ জুড়ায়, মন জুড়ায়। তবু প্রাণ কাঁদে সেই ৫ সেগুনবাগিচার পুরানো বাড়ির জন্যে।

প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর নিয়মে সংঘ ভেঙে যায়। এক স্বপ্ন আর একই অঙ্গীকার নিয়ে যূথবদ্ধ পথ চলা হয় না। যতদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থাকবে ততদিন আমাদের চেতনায় ভাস্বর হয়ে থাকবেন আটজন দেশপ্রেমিক। যাঁরা আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে মুক্তিযুদ্ধকে প্রজন্মের কাছে মূর্ত করে ধরার এই অসামান্য কাজ সম্পাদন করেছেন। এখনো অনেক কাজ বাকি। যা আটজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে নিতে পারবেন না। ২০১৯-২০২০ না ফেরার জগতে চলে গেলেন সদাহাস্য কবি রবিউল হুসাইন যিনি স্নেহ ও প্রেরণা দিতে কখনো কার্পন্য করেননি, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী আমার অনুরোধে একা গাড়ি চালিয়ে ভোর আটটায় চট্টগ্রামে শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে গিয়েছিলেন। আলী যাকের ভগ্ন শরীরে চার ঘণ্টা আমার সঙ্গে জীবনের নানান পর্যায় নিয়ে অকপটে কথা বলেছিলেন।

তাঁরা প্রত্যেকেই দেশপ্রেমিক হিসেবে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। অফুরন্ত আগামী তাঁদের ত্যাগ ও অবদান গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে তাঁদের কাজের মধ্যদিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আটজনের ঐক্য অটুট রাখবে চিরদিন।

হাসান আরিফ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি অন্বেষী ক্যারাভান

২০০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝিতে মৌলভীবাজার লংলা আধুনিক ডি-গ্রি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহিবুর রহমান বুলবুল স্যার আমাকে জানালেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রম এ কলেজে চালাতে হবে। সানন্দে এই দাযত্বি বুঝে নিলাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে রন-জিৎ দা ও রঞ্জন দা এলেন। রঞ্জন দা কে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। অনেক অনেক দিন পর দেউন্দি চা বাগানের খুবই প্রিয় শ্রদ্ধেয বড ভাই কে কাছে পেযে। কাজ শুরু হলো ৬ আগস্ট ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে হিরোশিমা নাগাসাকি দিবসে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনী ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিযে। এ এক বিস্ময়কর উৎসবে পরিণত হল সবুজের দ্বীপ গ্রামের এই কলেজে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ ভ্রাম্যমান জাদুঘর দেখে নতুনের আস্বাদে অবগাহন করে ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন গুলো দেখে বিজয়রে আনন্দে আত্মহারা হলেন। আর বিষাদ ময স্মৃতি চিহ্ন দেখে ব্যথিত হলেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা সংগ্রহ, শিক্ষক সম্মিলনী, শিক্ষার্থী কর্তৃক সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার বই ও দেযালিকার মধ্য দিযে নতুন প্রজন্ম ও আমি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উদঘাটনের প্রেরণায সাহসী ও দাযত্বিশীল হতে শুরু করি। বিশেষ করে বধ্যভূমি শনাক্ত, শহীদদের সমাধি সংরক্ষণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কার্যক্রম করতে গিযে কুলাউডা উপজেলার পৃথিমপাশা ইউনিযনের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদের আত্মদান উন্মোচনের কাজ শুরু করি। স্থানীয প্রভাবশালী রাজাকারদের গুলিতে নিহত শহীদ সগীরের সমাধি অবহেলায ও অযত্নে নদীর গর্ভে যখন বিলীনরত তখন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সগীর - শহীদ বশির স্মৃতি রক্ষা কমিটির মাধ্যমে মাননীয সংসদ সদস্য আব্দুল মতিন এর নেতৃত্বে স্থানীয বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, তৎকালীন ইউএনও চৌধুরী গোলাম রাব্বি, এলাকার স্থানীয নেতৃবৃন্দ ও জনতার সহ-যোগিতায সমাধিটি পাকা, গার্ড ওযাল নির্মাণ ও বধ্যভূমি চিহ্নিত হয। উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সমযে বীর মুক্তিযোদ্ধা সগীর ও বশির দুই বন্ধুকে ফকিরের গ্রাম ভাটগ-াওযে রাজাকাররা ঘেরাও করে গুলিবর্ষণ করলে সগীরের মৃত্যু হয ও বশির মৃত্যুর ভান করে পডে থাকেন। রাজাকাররা চলে যাওযার পর আহত অবস্থায বশির নিজ গ্রাম মনরাজে ফিরে এলে পাকিস্তানি মি-লিটারি তাঁকে ধরে নিযে কুলাউডার চি-ডলবাডি বধ্যভূমিতে পুঁতে ফেলে।আর সগীরের লাশ দাফন করা হারাম ফতোযা দেযায তিনদিন লাশ পডেছিল বাডিতে। পরবর্তীতে আত্মীয-স্বজনরা খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে ভযে ভযে জানাযা পডে শুকনাছডা নদীর পাডে ঝোপ-জংগলের মাঝে কবর দেয। এ ঘটনার পর ভাটগাঁও গ্রামের মানুষদেরকে নির্মমভাবে দীর্ঘদিন অত্যাচার করে মিলিটারিরা। আর স্বাধীনতার পর স্থানীয প্রভাবশালীদের রক্ত চক্ষুর কারণে তাদের স্মৃতি বিলীন হতে থাকে। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সগীরের সমাধি রক্ষায আমাদের দুঃসাহসী সাফল্যের পেছনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৫ বছরের অবিরাম পথচলা প্রেরণা যুগিযেছে। এবার বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ বশিরের স্মৃতিকে অম্লান রাখতে লংলা স্টেশনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা রযছে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসন এগিযে এলে কাজটি আরো সহজতর হবে। প্রিয বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মহান স্মৃতিকে দীপ্যমান রাখতে এ জাদুঘরের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এ প্রতিষ্ঠান ধাত্রীর মতো পরম মমতায মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি গুলোকে ভূমিষ্ঠে সহ-যোগিতা করছে আর ভালোবেসে প্রতিপালনো করছে। সমগ্র বিশ্বে তথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুদ্ধবিরোধী মানবতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। রজতজযন্তীতে মুক্তি অন্বেষী এই ক্যারাভানের ভালোবাসা ও মানবিকতার আলোকময যাত্রা আরো বেগবান হোক অজ্ঞতা ও বর্বরতার আঁধারে।

মাজহারুল ইসলাম রুবেল
সহকারি অধ্যাপক ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক
লংলা আধুনিক ডিগ্রী কলেজ

ক্যামেরায় গাঁথা ইতিহাস

সময়টা ১৯৯৫-৯৬। তখন আমি সংবাদ পত্রিকায় ফটো সাংবাদিক হিসেবে কাজ করি। প্রস্তুতি চলছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার। নিজের তাগিদেই সেগুনবাগিচার জাদুঘর ভবনে যেতাম, বিভিন্ন স্মারকের ছবি তুলতাম। জাদুঘর তখন নানামুখী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি তুলতাম। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হতে থাকি। আক্কু ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। মফিদুল ভাই ডাকতেন বিভিন্ন সময়ে। এই সূত্রে আমার সুযোগ ঘটে জাদুঘরে আগত বিশিষ্টজনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং তাদের ছবি তোলার। যাদের মধ্যে ছিলেন জগজিৎ সিং অরোরাসহ অনেকে। অরোরা যখন এসেছিলেন জাদুঘরে তখন কেউ একজন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি আসতে এত দেরি করলেন কেনো। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'এতদিন কেউ আমন্ত্রণ জানায়নি, এখন জাদুঘর আমাকে ডেকেছে'। আজকের স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠছে ভুপেন হাজারিকার কথা। জাদুঘর পরিদর্শন শেষে তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমাকে গেটের সামনে একটা ছবি তুলে দেওয়। পেছনে যেনো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর লেখাটা থাকে। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী সুমন চট্টপাধ্যায়ের ছবি তুলতে তুলতে বলেছিলাম, 'আমরা আপনার ভক্ত, এত দাম রাখা হয় কেনো আপনার টিকেটের, আমরা যেতে পারি না'। তিনি বললেন, বন্ধু আক্কু আমাকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এনেছেন এখন আপনারা সহজেই আমার গান শুনতে পারবেন। মনে পড়ছে সুমনকে তার ছবির একটি অ্যালবাম দিয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন সেটি তার মেয়ের কাছে রাখবেন যাতে মেয়ে সেটি সযত্নে সংরক্ষণ করেন। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কলকাতায় তার বাড়িতে যাওয়ার। আর সবচাইতে বড় পাওয়া ছিল তার আগমন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের মলাটে আমাকে দেয়া তার অটোগ্রাফটি। এখনও সযত্নে রেখেছি সেই স্মৃতি।

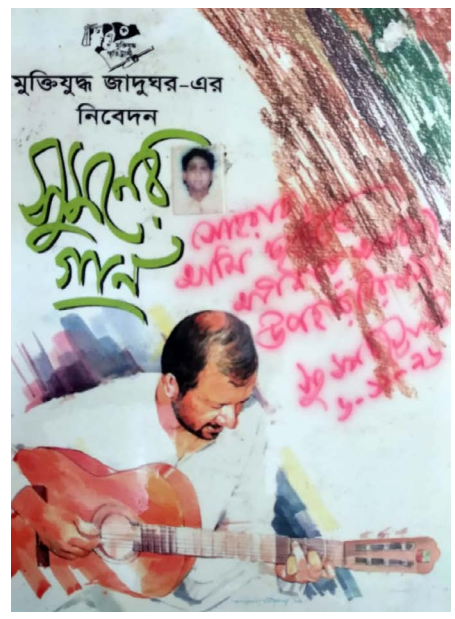

জেনারেল জ্যাকব যখন আসেন তখন ঘটেছিল একটি দুর্ঘটনা। তখন তিনি বয়োবৃদ্ধ, যে গাড়িতে আসলেন তার সামনের সিটে বসা প্রটোকল অফিসার খুব তাড়াহুড়ো করে দরজা বন্ধ করতে গেলে জেনারেল জ্যাকবের হাতের আঙ্গুল চাপা পড়ে। গেটের সামনে অপেক্ষমান আমরা সবাই তার চিৎকার শুনতে পেলাম এবং তার হাত মুঠো করে উপরে তুলে নাড়াতে দেখলাম। সবাই ভেবেছিলাম তিনি আনন্দে জয়ধ্বনি করছেন। পরমুহূর্তে সবার ভুল ভাঙ্গে। এভাবে হাজার হাজার স্মৃতি জমা হয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে। ভাবতে ভালো লাগে যে, জাদুঘরের অনেক আয়োজনের সঙ্গে আমার স্মৃতি জাড়িত।

সোহরাব আলম
প্রধান আলোকচিত্রী, দৈনিক সংবাদ

গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সূচনা পর্ব : ১৯৯৫-৯৬

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট ঢাকা মহানগরীতে একটি 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত এই জাদুঘরে মহান মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, বই, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র, তথ্য, স্মৃতি সংরক্ষণসহ মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জন স্থান পাবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপনের একটি বেসরকারি উদ্যোগ

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্টের কাছে গল্লামারীর বধ্যভূমির মাটি হস্তান্তর

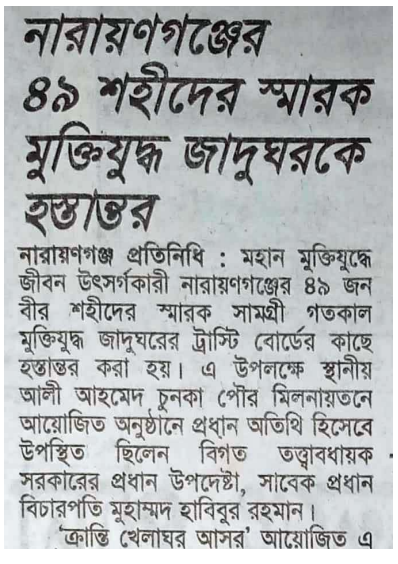

খুলনা অফিস : খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, জাতির গৌরবময় বীরগাথা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ইতিহাস আগামী প্রজন্মের জন্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

তিনি বুধবার স্থানীয় জিয়া হলে ঢাকাস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য খুলনা গল্লামারী বধ্যভূমির পবিত্র মাটি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।

বধ্যভূমির মাটি

চট্টগ্রাম অফিস : মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ জাদুঘরে চট্টগ্রাম বধ্যভূমির মাটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাদুঘরের সংগঠক বিশিষ্ট অভিনেতা আলী যাকেরের নেতৃত্বে আসা একটি দলের কাছে প্রতীকী মাটি হস্তান্তর করবেন সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী। আগামীকাল সোমবার সকাল ৯টায় পাহাড়তলী ফয়েজ লেক বধ্যভূমির মাঠে এক অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে রঞ্জিত এ মাটি হস্তান্তর করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাঙালির জাদুঘর

স্মারক ও নিদর্শন সংগ্রহ শুরু

বৃষ্টিভেজা-স্মৃতিভেজা মানুষের প্রাণের জোয়ারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্বোধন

তাজউদ্দিন জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছেন যে প্রদর্শনীতে

পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশনাল ম্যাপ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর

কাগজ প্রতিবেদক : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজির বাঙ্কারে পাওয়া অপারেশনাল ম্যাপটি ভারতীয় হাইকমিশন গতকাল বৃহস্পতিবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করেছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দেব মুখার্জী গতকাল সকালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ম্যাপটি হস্তান্তর করেন। জাদুঘরের পক্ষে আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, সরু চৌধুরী, মফিদুল হক, সারা যাকের প্রমুখ ম্যাপটি গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘরে স্মারক গ্রহণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল সোমবার বিকেলে সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে স্মারকদ্রব্য গ্রহণ করা হয়। স্মারকদ্রব্য গ্রহণ করেন মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান এ কে খন্দকার ও প্রফেসর আনিসুজ্জামান।

নারায়ণগঞ্জের ৪৯ শহীদের স্মারক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে হস্তান্তর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী নারায়ণগঞ্জের ৪৯ জন বীর শহীদের স্মারক সামগ্রী গতকাল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ উপলক্ষে স্থানীয় আলী আহমেদ চুনকা পৌর মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

'ক্রান্তি খেলাঘর আসর' আয়োজিত এ

Muktijoddha Museum opens

By Staff Correspondent

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে স্মৃতিমাখা সংগ্রহযোগ্য উপকরণ দিলেন শহীদদের সন্তানরা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : আনন্দঘন বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

১৯৯৭ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং স্থায়ী সদস্যপদ গ্রহণ করেন

১৯৯৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক মিরপুর ১০ নম্বর সেক্টরের ঝুটপল্লীতে অবস্থিত জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে খনন করে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন শহিদদের দেহাবশেষ ও তাদের ব্যবহৃত সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। খনন কাজে সহায়তা প্রদান করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৬ পদাধিক ব্রিগেড। পরবর্তীতে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সহায়তায় ২০০৭ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংরক্ষিত এ বধ্যভূমিতে একটি স্মৃতিপীঠ উদ্বোধন করে।

শুরুর মন্তব্য খাতা থেকে

মহতী প্রয়াস সফল হোক, বাঙালী জাতি সম্বিত ফিরে পাক।

সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাসেম/মঞ্জুর মোরশেদ

জন্ম আমার '৭৩ এ। কিছু জেনেছি, বাবার কথায়। যা জেনেছি, যা জানতে চাচ্ছি এই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এদের জন্য কিছু একটা করা খুবই গর্বের বিষয়। 'জাতির' সঠিক মূল্যায়নের প্রতিক্ষায়।

শাহিন মাহমুদ শামিম
৭৫-জে আজিমপুর কলোনি, ঢাকা

এই উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল। এটা একটি অঙ্গীকার রক্ষার বিষয় ও নিজেকে জানার প্রচেষ্টা। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

আবুল মাল আব্দুল মুহিত

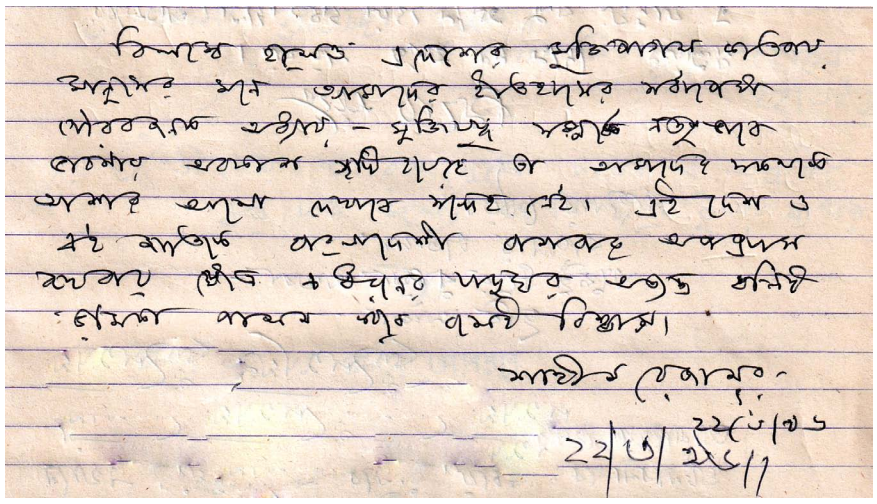

বিলম্ব হলেও এ দেশের মুক্তিপাগল কতিপয় মানুষের মনে আমাদের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবনার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের সকলকে আশার আলো দেখাবে সন্দেহ নেই। এই দেশ ও এই জাতিকে বাংলাদেশী বানাবার অপপ্রয়াস রুখবার ক্ষেত্রে এ ধরনের জাদুঘর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে বলেই বিশ্বাস।

শাহীন রেজা নূর
২২/০৩/৯৬

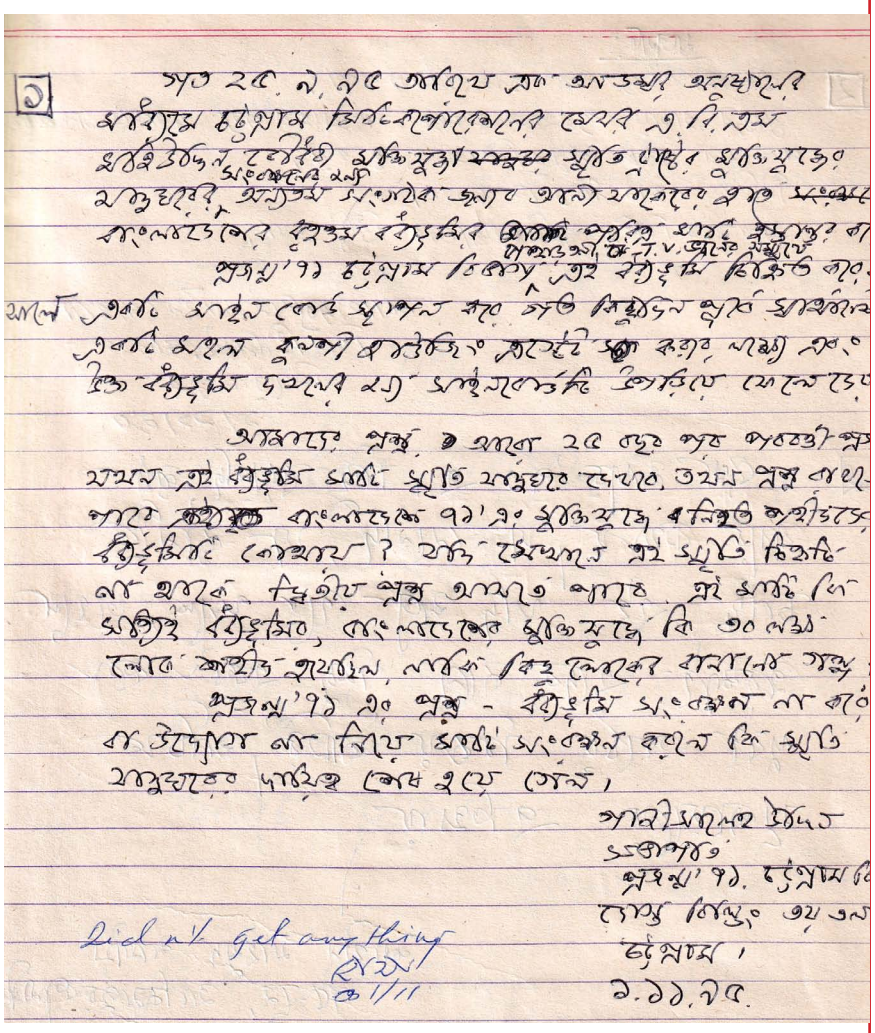

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিহতকরণে এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

ইকবাল হোসেন কায়কোবাদ
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা
পুরানাপল্টন, ঢাকা

স্মৃতির পথে হাঁটা

৩০ এপ্রিল ১৯৭১ 'দি ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশি সাংবাদিক সায়মন ড্রিংক-এর পাঠানো প্রতিবেদনের মাধ্যমেই বিশ্ব সর্বপ্রথম বাংলাদেশের গণহত্যার সংবাদ পায়। আগস্ট ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সায়মন ড্রিংককে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

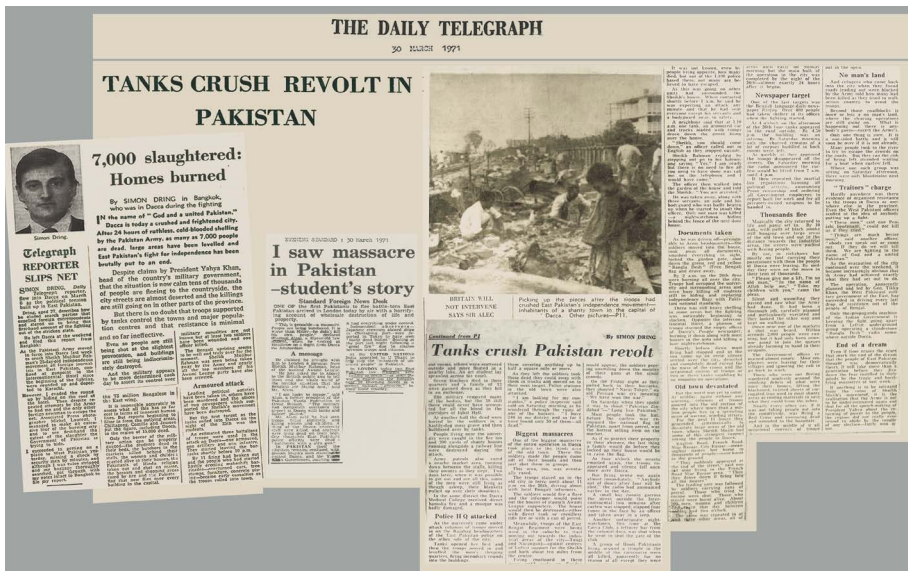

THE DAILY TELEGRAPH
30 MARCH 1971

TANKS CRUSH REVOLT IN PAKISTAN

7,000 slaughtered: Homes burned

I saw massacre in Pakistan –student's story

Tanks crush Pakistan revolt

শ্রদ্ধাঞ্জলি

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকার, অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। কঁচিকাঁচা মেলার প্রতিষ্ঠাতা রোকনুজ্জামান দাদা ভাইয়ের মৃত্যুর পর শিশু-কিশোরদের এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তিনি নিজের কাধে তুলে নেন। এভাবেই দেশের শিশু-কিশোররা যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং তার ভাবদর্শে দীক্ষিত হয় সে বিষয়ে নানা উদ্যোগের বিষয়ে তিনি জড়িত ছিলেন। ২০০৩ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর লটারির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে সময় তিনি পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং সকল গ্রাহককে লটারির টিকিট ক্রয়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন সৎ, স্বাধীন চেতা, আর্থিক ব্যবস্থাপক ও শিশু-কিশোরদের পরম পবন্ধুকে হারিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাঁর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত।

স্মরণ

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরুর সময়ের স্মারক সংগ্রাহক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিনকে। তিনি গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। রাজাকাররা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলে মায়ের সহায়তায় মায়ের শাড়ি পরে বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করেছেন কিছু দুর্লভ স্মারক।

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯৩৩ – ২৫ মার্চ ১৯৭১)
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে প্রথম শহিদদের অন্যতম। সেই রাতে পাক বাহিনীর একটি দল এলিফেন্ট রোডের বাসা থেকে টেনে বাইরে এনে রাস্তার উপর তাঁকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত তার ব্যবহৃত ইউনিফরম ও বায়নোকুলার

দাতা: কোহিনুর বেগম

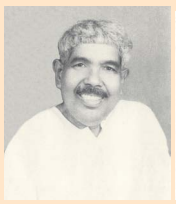
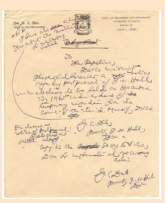
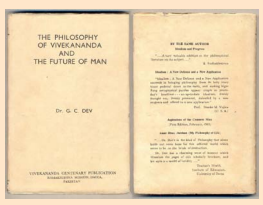

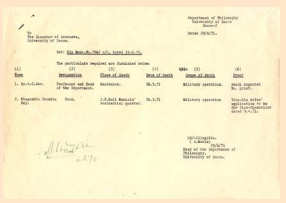

গোবিন্দ চন্দ্র দেব (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ – ২৬ মার্চ, ১৯৭১)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব ছিলেন আজীবন অকৃতদার, সন্যাসিসুলভ অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার অধিকারী। ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে এবং তাঁর পালিত কন্যার স্বামী মোহাম্মদ আলীসহ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। গোবিন্দ চন্দ্র দেব-এর হাতেলেখা চিঠি, তাঁর রচিত গ্রন্থের ইনারপেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে ২৯ জুন ১৯৭১ লেখা চিঠি যা নিশ্চিত করে ২৬ মার্চ সামরিক অভিযানে ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মৃত্যু।

দাতা: প্রদীপ কুমার রায়

মধুসূদন দে (১৯ এপ্রিল, ১৯০৭ – ২৬ মার্চ, ১৯৭১)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্যান্টিন পরিচালক মধুসূদন দে-র নাম। মধুদা নামে পরিচিত মানুষটি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী ছাত্রদের একান্ত কাছের স্নেহপ্রবণ অগ্রজসম। ২৫ মার্চ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণাভিযানের সময় তাঁর আবাস হয়ে ওঠে বিশেষ লক্ষ্য। সৈন্যরা ঘরে ঢুকে হত্যা করে মধুসূদনের স্ত্রী, নব-বিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূকে। আহত মধুসূদন দে-কে টেনে-হিঁচড়ে নেয়া হয় জগন্নাথ হলের মাঠে এবং আরো অনেকের সঙ্গে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়া হয় তাঁর লাশ। মধুসূদন দে'র ব্যবহৃত শার্ট।

দাতা: অনিমারানী দে, প্রতিভারানী দে, রানুরায়, আরতিরানী দাস

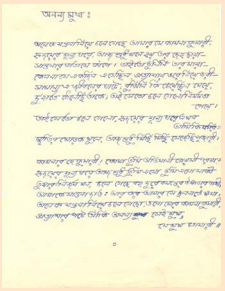
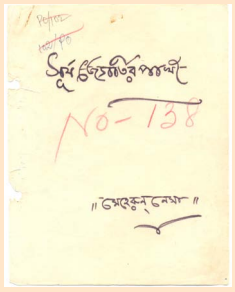

কবি মেহেরুন্নেসা (২০ আগস্ট, ১৯৪২ – ২৮ মার্চ, ১৯৭১)
কবি মেহেরুন্নেসা ১৯৫০ সালে ভারতের পশ্চিমবাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। জীবিকার তাগিদে তিনি রেডিও পাকিস্তান ও বাংলা একাডেমিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করতেন। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও মেহেরুন্নেসা কবিতা চর্চায় নিবেদিত ছিলেন এবং সাহিত্যিক মহলে পরিচিতি অর্জন করেন। পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। '*সূর্য-জ্যোতির পাখি*' শীর্ষক কবিতার বইয়ের পান্ডুলিপিও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।
২৮ মার্চ সশস্ত্র একদল অবাঙালি তাঁদের বাসায় প্রবেশ করে মেহেরুন্নেসাকে নিষ্ঠুরভাবে কুপিয়ে হত্যা করে।
কবি মেহেরুন্নেসার কবিতার পাণ্ডুলিপি

দাতা: মোমেনা খাতুন

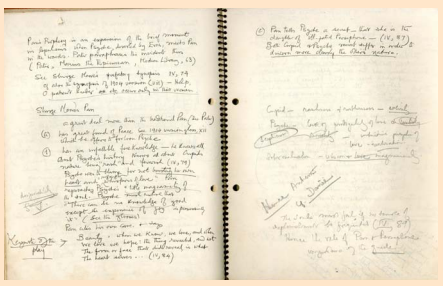

ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (১০ জুলাই, ১৯২০-৩০ মার্চ, ১৯৭১)

১৯৪২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সমাপনের পর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ১৯৪৯ সালে সেখানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় তাঁর যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় উদার অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনাসম্পন্ন '*নিউ ভ্যালুজ*' সাময়িকী। পরে তিনি লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে পিএইচ.ডি উপাধি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক এবং জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট।
২৫ মার্চ রাতে পাকসেনারা তাঁকে ঘর থেকে পেছনের আঙিনায় নিয়ে গুলি করে ফেলে যায়। কারফিউয়ের মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী অধ্যাপককে ধরাধরি করে কোনোক্রমে ঘরে নিয়ে আসেন তাঁর স্ত্রী ও কিশোরী কন্যা। কিন্তু তাঁর ক্ষত উপশমের জন্য কিছুই করা যাচ্ছিল না। পরে কয়েকজন ছাত্র জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলেও প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হয় নি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে ৩০ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার নোটবই

দাতা: মেঘনা গুহঠাকুরতা

অপারেশন সার্চলাইট, ২৫ মার্চ ১৯৭১

মার্চ ১৯৭১- নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সংবিধানিক ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করার উদ্যেশে। তিনদিন পর ১৮ মার্চ মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাওফরমান আলী এক সঙ্গে একটি সামরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। অপারেশন সার্চলাইট হিসেবে খ্যাত এই পরিকল্পনাটি ২০ মার্চ পড়ে শোনানো হয় জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সেটি অনুমোদন করেন। পরবর্তীতে আলোচনা চলাকালিন সময়ে আকর্ষিকভাবে ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। নির্দেশ দিয়ে যান সামরিক অভিযান 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করার। পরিকল্পনা মতো রাতের অন্ধকারে সেনাবাহিনী ব্যারাক থেকে বেরিয়ে সূচনা করে যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ড, চালায় সুনির্দিষ্ট সামরিক আঘাত। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যাযজ্ঞের শিকার শহীদ সাধারণ নাগরিক

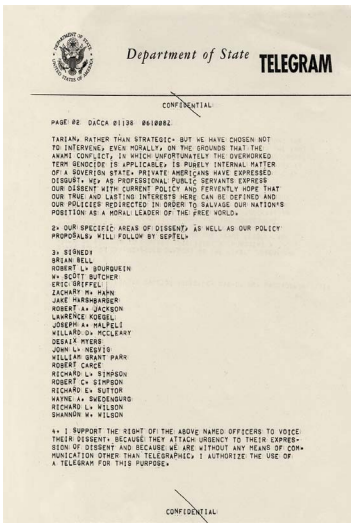

জেনোসাইডের নিন্দাবাদ : প্রথম প্রতিক্রিয়া

পাকবাহিনী পরিচালিত ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ যে জেনোসাইডের লক্ষণ আক্রান্ত তার প্রথম প্রতিফলন মেলে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে. ব্লাড কর্তৃক ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত গোপন বার্তায়। ২৮ মার্চ প্রেরিত টেলিগ্রামের শিরোনাম তিনি দেন 'দ্যা সিলেক্টিভ জেনোসাইড'। বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ে মার্কিন কনসাল আর্চার কে. ব্লাডের টেলিগ্রাম দাতা: রাষ্ট্রদূত মারসিয়া স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকেট

৩ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগর্নি পাকপ্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে পত্রে সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান।

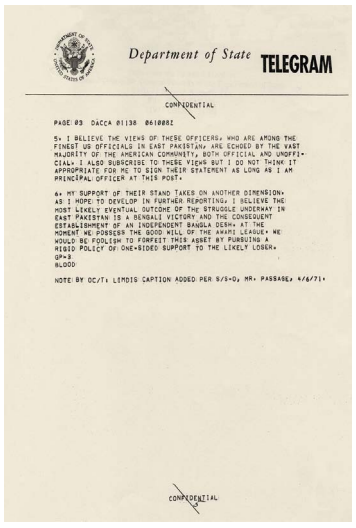

THE TIMES

Friday April 2 1971

No. 58,137 Price 5p

Pakistan army said to be wiping out leaders in brutal war

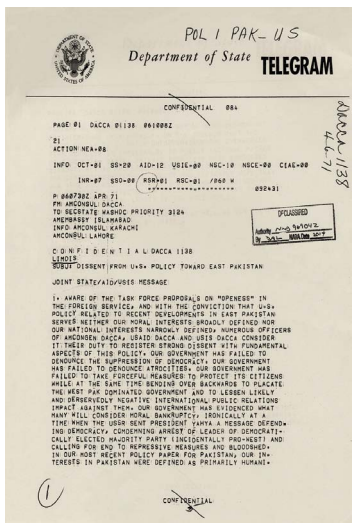

By Louis Heren

War of genocide in East Pakistan

INDIA NEWS

ISSUED EVERY WEEK BY THE INFORMATION SERVICE, EMBASSY OF INDIA
2107 MASSACHUSETTS AVENUE, N.W., WASHINGTON, D.C. 20008 • TELEPHONE (202) 265-5050

Vol. X April 9, 1971 No. 2

EAST PAKISTAN

Parliament's Grave Concern Over Developments

Appeal to World Governments To End Genocide

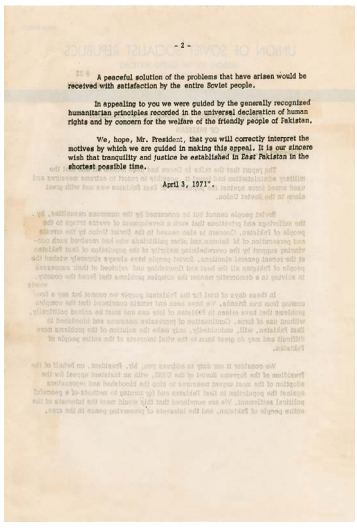

Resolution in Both Houses

The following is the text of the resolution moved by the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, in both Houses of Parliament on March 31:

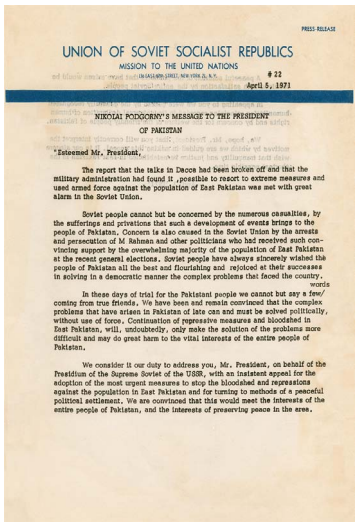

"This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. Massive attack by armed forces dispatched from West Pakistan has been unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

"Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

"The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to the legally elected representatives but has arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightful and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to be suppressed by naked use of force by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft.

"The Government and people of India have always desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. Situated as India is and bound as peoples of the sub-continent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border. Throughout the length and breadth of our land our people have condemned in unmistakable terms the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon unarmed and innocent people.

"This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for democratic way of life.

"Bearing in mind the permanent interests which India has in peace, committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of use of force and massacre of the defenceless people. This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of the people which amounts to genocide.

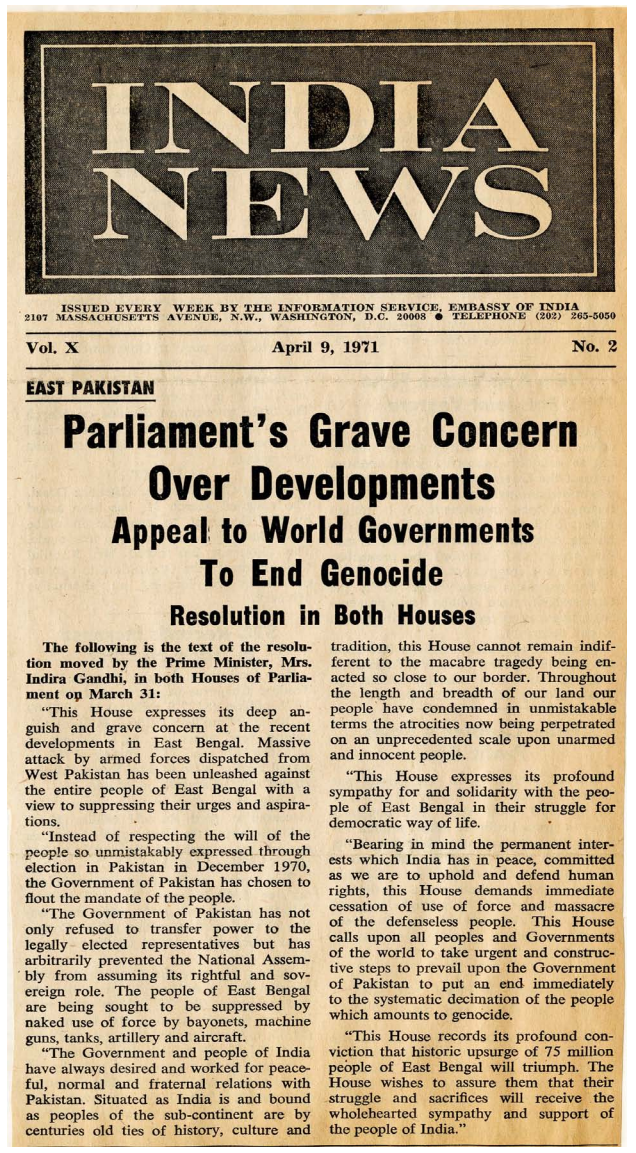

"This House records its profound conviction that historic upsurge of 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India."

৩১ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্ট বন্দের আহ্বান জানিয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক সংসদীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ১ এপ্রিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলায় সমবেত বাংলাদেশের ৩৫ জন গণ-পরিষদ সদস্য গণহত্যাবন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতীসংঘ মহাসচিবের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন

২৫ মার্চ কাল রাত্রের সাক্ষী : সুফিয়া কামাল ও স্বাতী চৌধুরী

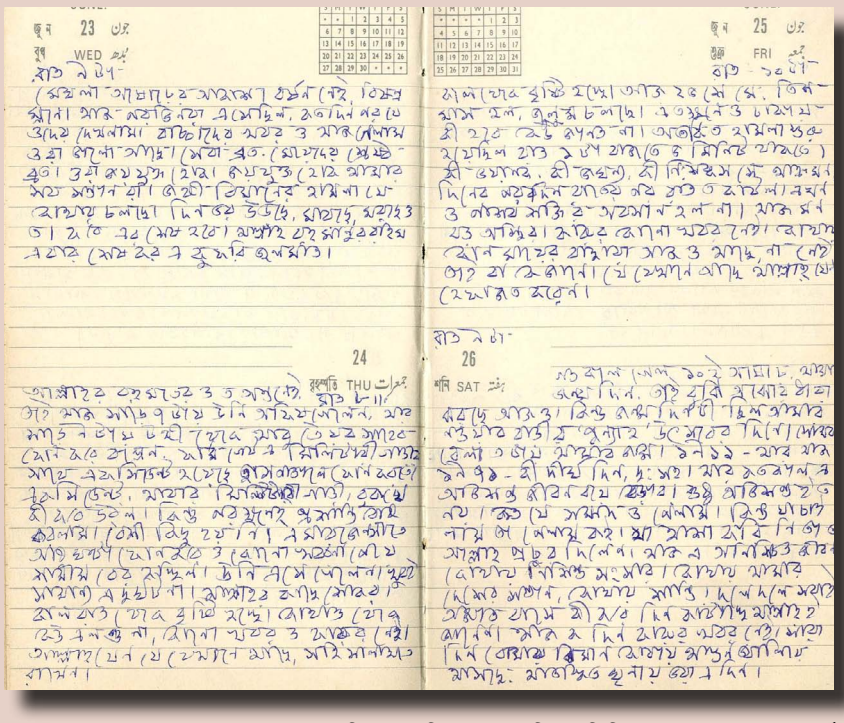

৫০-এর দশকের সূচনা থেকে বাঙালি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন আন্দোলন ও কর্মে সামনের কাতারে ছিলেন সুফিয়া কামাল। সকলের জন্য তিনি ছিলেন প্রেরণাদাত্রী। তাঁর ডায়েরিতে মেলে ঢাকায় ২৫ মার্চ কালরাত্রী এবং পরবর্তী দিনগুলোর ভয়াবহতা

সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী স্বাতী চৌধুরীর স্কুলের খাতায় লেখা হয়েছে চার পাশে আহাজারী, গুলি ও আত্মনাদের কাহিনী। নাখালপাড়ার বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকার পরিস্থিতির শ্বাসরুদ্ধকর বিবরণ মেলে এই লেখায়

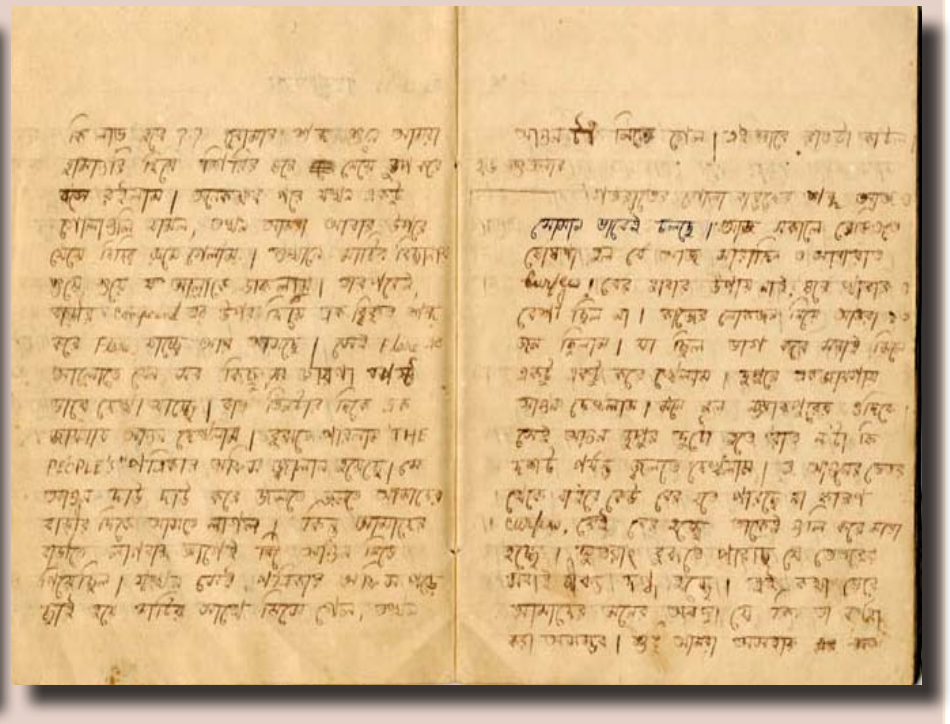

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণের’ ৫০ বছর পূর্তি

‘বিশ্বজুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ভাষণ’ শিরোনামে বিশেষ প্রদর্শনী

বঙ্গবন্ধু’র ৭ মার্চ ভাষণের পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনী গতকাল রোববার (৭ই মার্চ ২০২১) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গনে শুরু হয়েছে। ‘বিশ্বজুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ভাষণ’ শিরোনামের এ প্রদর্শনীটি আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে।

কম্বোডিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার গণহত্যা প্রতিরোধ সংগ্রামী, ইতিহাসবিদ ও ইউনোস্কো আন্তজার্তিক উপদেষ্টা পরিষদ, মেমরী অব দ্যা ওয়ার্ল্ডের পূর্বতন সদস্য হেলেন জারভিস ভার্চুয়ালি এ প্রদর্শনীর উদ্ধোধন করেন।

উদ্ধোধনী বক্তৃতায় হেলেন জারভিস সাত মার্চ ভাষণের পূর্বাপর বর্ণনা করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি অনেক ঐতিহাসিক মূল্যবান দলিলপত্রও নষ্ট হয়েছে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সাত মার্চের ভাষণ অক্ষতভাবে সংরক্ষণ করা গেছে। তিনি বলেন, মেমোরী অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামটি সারা বিশ্বের ডকুমেন্ট, হেরিটেজ সচেতনতা, সংরক্ষণ এবং উপলব্ধি করার জন্য ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ২০১৭ সালে আমি ওয়ার্ল্ড মেমোরী অফ ওয়ার্ল্ডের আন্তজার্তিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য থাকাকালীন সময়ে সাত মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশের মনোনয়নের প্রতি আমার সমর্থন জানিয়েছি এবং ভোট দিয়েছি।

বঙ্গবন্ধু’র সাত মার্চের ভাষণ জনগণকে স্বর্তঃফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে উল্লেখ করে হেনরী বলেন শেখ মুজিবর রহমান আট মাস ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও তাঁর এই ভাষণে জনগণ অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিয়েছিলো এবং একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হয়েছে।

‘বিশ্বজুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধব্বনিত ভাষণ’ শিরোনামের প্রদর্শনীটিতে মোট ৭২ টি স্মারক প্রদর্শিত হচ্ছে যার মধ্যে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী ৪৯টি। পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীর মধ্যে সংবাদ, আজাদ, ইত্তেফাক, স্বরাজ, দ্যা সানডে পিপলস, দ্যা পিপলস, পাকিস্তান অবজারভার, দ্যা সান, মর্নিং নিউজ, গার্ডিয়ান, নিউ ইর্য়ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোষ্ট, ডেইলি টেলিগ্রাফ, টাইমস, জাপান টাইমস, নিউজ উইক, আসাহি ইভিনিং নিউজ ও মাঞ্চি ডেইলির দুলর্ভ কপি প্রদর্শিত হচ্ছে। বাকী প্রদর্শিত স্মারকগুলো হচ্ছে দলিলপত্র, ডায়েরি ও ডকুমেন্টস ৯টি, আলোকচিত্র ৫টি , ভিডিও ১টি, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন ৮টি।

প্রদর্শিত স্মারক সমূহের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ স্মারকগুলো হলো:- ৭ মার্চ সন্ধ্যায় বিদেশি সাংবাদিকদের আওয়ামী লীগ প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ইউনেস্কো কর্তৃক মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি প্রদানের সার্টিফিকেট ও দলিল,ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণের উক্তি সমূহ, ৭ মার্চ ভাষণের প্রত্যাক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধা আইয়ুব বিন হায়দার এর ভাষ্য একটি মনিটরে উপস্থাপন করা হয়েছে। কয়েকটি পাঠ উপযোগী উপকরণ স্পাইরাল এবং ই-বুক আকারে একটি টাচ-স্ক্রিনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রুতি দৃশ্য কেন্দ্র নির্মিত কোলাজ ফিল্ম ‘মুক্তির স্বরলিপি’ প্রদর্শিত হয়। কোলাজ ফিল্ম প্রদর্শনের পর আমন্ত্রিত অথিতিরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লবিতে ঐতিহাসিক ৭ ই মার্চের ভাষণের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনী ‘বিশ্ব জুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ভাষণ’ ঘুরে দেখেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকেরসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মির্জা মাহমুদ আহমেদ

১ মিনিটের চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

প্রতিবছরের মত এবারেও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্চে লিবারেশন ডকফেস্ট। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আযোজিত উৎসবটির নবম আসর অনুষ্ঠিত হবে ৬-১০ এপ্রিল ২০২১। এই উৎসবের একটি অংশ ‘১ মিনিটের চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা’। এর অংশ গত ৮ ও ৯ মার্চ ২০২১ একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত দুইদিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে কল্যাণপুর গার্লস স্কুল, ঢাকা কমার্স কলেজ, আগারগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ইউসেপ ইসমাইল স্কুল এবং মিরপুর গার্লস আইডিয়াল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। কর্মশালাটির প্রশিক্ষক ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ফরিদ আহমেদ ও হুমায়ুন কবির শুভ। কর্মশালা শেষে শিক্ষার্থরিা পাঁচটি ১ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে।

প্রামাণ্যচিত্রগুলো হলো-

১. শরণার্থী আমার দাদু, ২. ৭১-এর পথ চলা, ৩. জাদুঘর, ৪. অসমাপ্ত ও ৫. ভুলিনাই

বিগত ২৫ বছরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংগ্রহশালায় যুক্ত হয়েছে শহীদ পরিবারের অনেক স্মৃতি। শহীদদের স্মারক প্রদান করেছেন তাদেরই স্বজনরা। তেমনই দু'জন শহীদ স্বজনকে নিয়ে এই আয়োজন *–আমেনা খাতুন*

শহীদ রেহানার ব্যাবহৃত জামা

শহীদ রেহানার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম খান বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের আহবানে সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই স্থানীয় তরুণদের প্রশিক্ষণ দেন এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই খবর ছড়িয়ে পরার পর ঘোষণা দেয়া হয় আবদুস সালাম খানকে জীবিত ধরিয়ে দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা এবং মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

৩০ এপ্রিল ১৯৭১ স্থানীয় রাজাকাররা পাকিস্তানী সৈন্যদের নিয়ে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে। আবদুস সালাম খানকে বাড়িতে না পেয়ে পাকিস্তানী সৈন্য ও তাঁদের দোসররা বুটের তলায় পিষে তাঁর চার মাস বয়সী শিশু কন্যা রেহানাকে হত্যা করে। রাতের অন্ধকারে গোপনে রেহানার বাবা বাড়িতে আসেন। তিনি রেহানার শবদেহ ধুয়েমুছে রুপসা নদীতে ভাসিয়ে দেন। রেহানার বাবার কাছে রেহানার কোনো ছবি ছিল না, তাই কন্যার স্মৃতি হিসেবে তিনি পরনের ফ্রক ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখেন।

জাদুঘর প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে ট্রাস্টিবৃন্দ বধ্যভূমির মাটি সংগ্রহের জন্য খুলনায় যান। মাটি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আবদুস সালাম খান ফ্রেমে বাঁধাই করা রেহানার ফ্রকটি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে আবদুস সালাম খান ট্রাস্টিদের সাথে দেখা করেন এবং রেহানার ফ্রকটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন। এরপর তিনি মাঝে মাঝে তাঁর কন্যার স্মৃতি বিজরিত স্মারকটি দেখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসতেন। এরকম একদিন আবদুস সালাম খান জাদুঘরে আসেন মেয়ের পরিহিত জামাটি দেখতে। আমি তখন গ্যালারীতে কাজ করি। একদিন আমি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের রেহানার বিষাদগাঁথা বর্ণনা শেষ করলাম, সেই সময় একজন ভদ্রলোক খুব শান্তভাবে আমাকে উপহার হিসেবে কিছু টাকা দিতে চাইলেন। আকস্মিক এ ঘটনায় আমি কিছুটা বিরক্ত হলে ভদ্রলোক তাঁর পরিচয়ে বললেন 'মা আপনি এতক্ষণ যার কথা ছাত্র-ছাত্রীদের বললেন,'আমিই সেই হতভাগ্য পিতা'। আমার মুখে 'রেহানার বিষাদগাঁথার' বর্ণনা শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি টাকাটা উপহার দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন 'আমার মেয়ে বেঁচে থাকলে আজ আপনার বয়সী-ই হতো। আজ থেকে আপনিই আমার রেহানা। আমি আপনাকে মা বলে ডাকবো'। আবদুস সালাম খান যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি বছরে এক-দুই বার জাদুঘরে আসতেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আক্কু চৌধুরীসহ অন্যান্য ট্রাস্টি ও কর্মীদের সাথে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিলো।

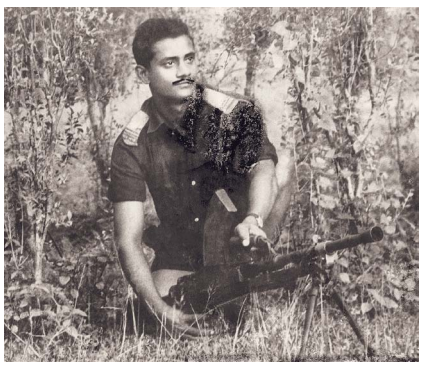

শহীদ রেহানার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম খান

জাদুঘরের স্থায়ী গ্যালারি ৪-এ প্রদর্শিত শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহেল বাকীর বিশেষ সেকশন

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকীর পিতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল বারী বিদেশী কোম্পানীতে উচ্চপদে চাকুরী করতেন। অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও বাকী ছিলেন রাজনৈতিক সচেতন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে বাকী সে সময় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। ২৫ মার্চ ক্র্যাক ডাউনের পর বাকী গৃহত্যাগ করে পাড়ি জমান ভারতে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে মাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন 'মা তুমি ভেবোনা, দেশের জন্য এটা খুব ক্ষুদ্রতম চেষ্টা' ভারতে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শেষে বাকী ফিরে আসেন ঢাকায়। তাঁর গেরিলা গ্রুপ ঢাকায় বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে।

বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে সহযোদ্ধাসহ তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে রাখা হয় খিলগাঁও রেললাইনের কাছে। শহীদ হওয়ার মাত্র দুইদিন আগে তোলা একটি আলোকচিত্রসহ শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী'র অনেক অমূল্য স্মারক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহে আছে।

২০০৭ সালে বাকীর বড় ভাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি তখন জাদুঘরের ডকুমেন্টেশন কর্মকতা হিসেবে কর্মরত। তিনি জানান তাঁর পিতার কাছে বাকীর স্মৃতি স্মারক গচ্ছিত আছে। তাঁকে বুঝিয়ে বললে স্মৃতি স্মারকগুলো তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করবেন। সেই সূত্র ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাকীর পিতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল বারীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কিছু স্মারক জাদুঘরে প্রদান করেন।

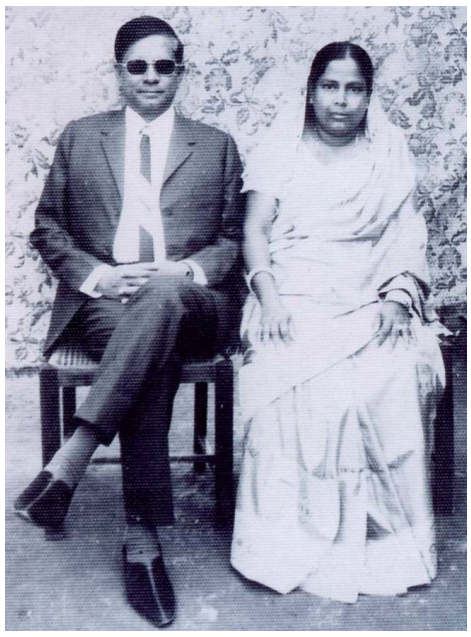

বাকীর পিতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল বারী এবং মাতা আমেনা বেগম

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল বারী আমৃত্যু ছেলের নিজ হাতে লেখা ডায়েরিগুলো আগলে রেখেছেন। ডায়েরির লেখাগুলো তিনি প্রায়ই পড়তেন আর ছেলের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। যার কারণে বাকীর অন্যসব স্মারক জাদুঘরে প্রদান করলেও ডায়েরিগুলো হাত ছাড়া করেননি। তবে প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর মৃত্যুর পর জাদুঘর কর্তৃপক্ষ ডায়েরিগুলো সংগ্রহ করতে পারবে। শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকীর পিতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল বারীর মৃত্যুর পর বাকীর পরিবারের সদস্যরা বাকীর পিতার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডায়েরিগুলো জাদুঘরে প্রদানের জন্য খোঁজ করেন। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও ডায়রীগুলোর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে আলমারীর ভেতরে তালাবদ্ধ সিন্দুকের মধ্যে মেরুন রঙের রুমালে পেঁচানো অবস্থায় ডায়েরিগুলো পাওয়া যায় এবং ২০১৭ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করা হয়।

ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়া এবং তাঁর দল-এর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রধান রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়া নিজস্ব প্রোটকলসহ সকাল ১০:৩০ টায় জাদুঘরে পৌঁছান। জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এসময় জাদুঘরের কর্মকর্তা চন্দ্রজিৎ সিংহসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সঙ্গে ছিলেন। শুরুতেই সারা যাকের অতিথিকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর -এর ট্রাস্টিবৃন্দ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি জাদুঘর কর্মকর্তা আমেনা খাতুনের গাইডেন্সে গ্যালারি পরিদর্শনের আহবান জানান।

প্রায় ৪০ মিনিটের মত সময় ধরে তিনি পুরো জাদুঘর পরিদর্শন করেন। স্বল্প সময়ে হলেও এটি অত্যন্ত অর্থবহ ট্যুর হয়েছে। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান কমেন্টস বইয়ে মন্তব্য লেখেন।

মেম্বার সেক্রেটারির সাথে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যসহ এ-জাতীয় যেকোন বিষয়ে দুপক্ষের সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে তাদের কিছু ডি-ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টস জাদুঘরকে প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আশ্বাস দেন।

পরিশেষে, ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান রাকেশ কুমার সিং ভাদুরিয়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকেরের হাতে একটি শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

আমেনা খাতুন, *ব্যবস্থাপক, কিউরেশন এন্ড আর্কাইভ*

৭ মার্চ স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্মারক বক্তৃতা

২০১৭ সালে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ডে'র আন্তর্জাতিক তালিকাভুক্ত হয় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। এ সময়ে এ সংগঠনের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ হেলেন জার্ভিস। ৭ মার্চ ২০১১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত বিশেষ স্মারক বক্তৃতায় ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন তিনি। তার রেকর্ড করে পাঠানো বক্তব্য জাদুঘর মিলনায়তনের আয়োজনে প্রদর্শিত হয়। তিনি তার বক্তব্যে এই ভাষণের পটভূমি ব্যাখ্যায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জাতির ভাষা-কৃষ্টি ও ইতিহাসের অখণ্ডতা রক্ষায় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি সংগ্রাম করে আসছিলেন। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে গোটা পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই ভাষণে জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, সাথে এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে দেশের নাম তিনি রেখেছিলেন বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বঙ্গবন্ধু উপাধির যথার্থতাই প্রমাণ করেছেন।'

তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মীদের রাত-দিন পরিশ্রমের ফলে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে তার হাতে তুলে দেবার জন্য 45 rpm vinyl রেকড প্রস্তুত হয়, পরবর্তীতে এটি পুরো পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবে কিছু সাহসী দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ পদ্মা মেঘনা যমুনার তীর থেকে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে পৌছায়, সুন্দরবন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ধ্বণিত হয় বঙ্গবন্ধুর বার্তা। পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বনিত এই ভাষণ পৌছে যায় বিশ্বের কাছে।

সৌভাগ্যের বিষয় যে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চলে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সেই নির্মমতা থেকে রক্ষা পেয়েছিল।'

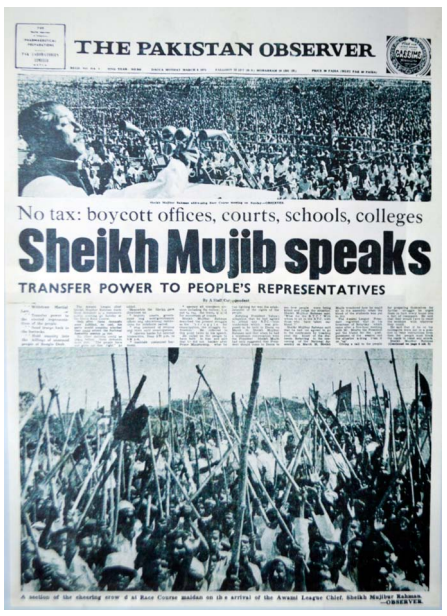

তার বক্তব্য থেকে জানা যায়, 'যদিও মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ডের সংজ্ঞা অনুসারে গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির বাইরেও যে কোন পদ্ধতিতে ধারনকৃত ও প্রচারিত ভাষ্যই দলিলের অন্তর্ভুক্ত, তবুও দেখা যায় খুব সামান্য কয়েকটি অডিও-ভিজ্যুয়াল দলিল তালিকায় স্থান পেয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক তালিকাভুক্ত ৩টি রেডিওতে সম্প্রচারিত বার্তার একটি। আন্তর্জাতিক তালিকায় 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' হিসেবে পরিচিত নথি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আপত্তির একটি বিষয় ছিল যে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এমন দলিল পাওয়া যায় সেটি তাদের প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সৌভাগ্যক্রমে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের দৃষ্টিতে ৭ মার্চের ভাষণ শুধু বাংলাদেশের জনগণের জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নয় বরং বিশ্ব মানবতার পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যবহ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাষণটি ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে; এটি শৈল্পিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন গণবক্তৃতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ; বাংলাদেশের ইতিহাসের পটপরিবর্তনকারী ঘটনা; একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় যা আঞ্চলিক সীমানা পরিবর্তন করেছিল। ভাষণটি বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের এক চকমপ্রদ দিক উন্মোচন করে, যার ফলে তিনি সম্মোহনীয় নেতৃত্বের দ্বারা জনগণের আকাঙ্খা উপলব্ধি এবং সেটি পূরোন করতে পারতেন। ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইটে যেমন বলা হয়েছে, এই ভাষণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেখানে জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বৈষম্যের কারণ হয় তাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।'

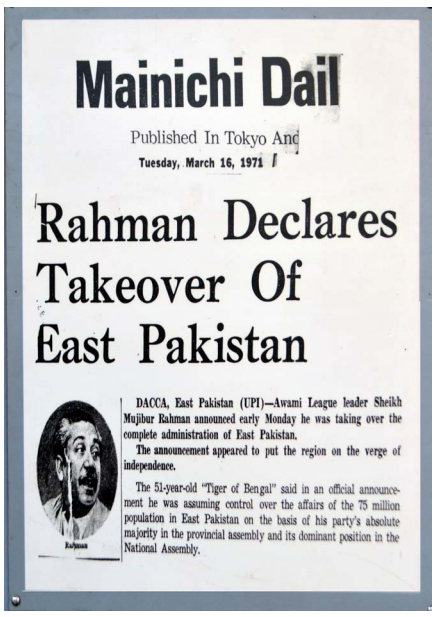

পরিশেষে তিনি কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং সংগ্রামের ইতিহাসের যে মিল রয়েছে তা উল্লেখ করেন।

মূল ইংরেজি বক্তব্য এবং বাংলা অনুবাদ নিচের লিংকে পড়ুন।

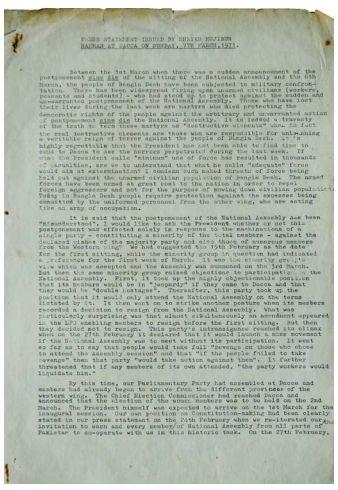

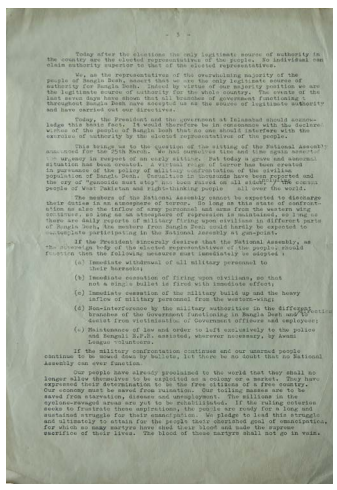

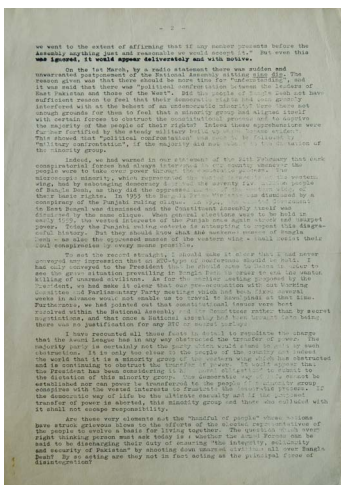

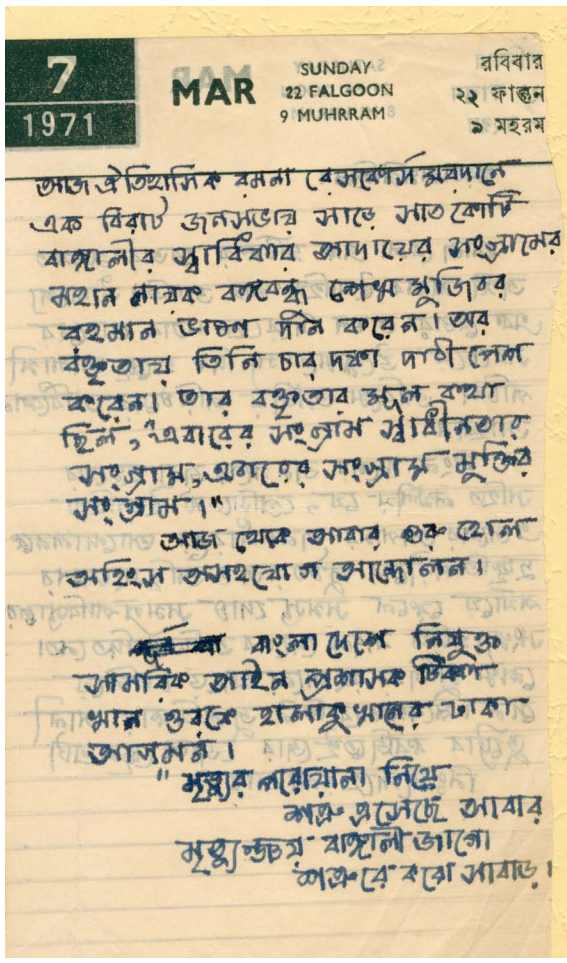

বাংলা লিংক-
http://www.liberationwarmuseumbd.org/wp-content/uploads/2021/03/7-March-by-Helen-Jervis.pdf

ইংরেজি লিংক-
http://www.liberationwarmuseumbd.org/wp-content/uploads/2021/03/The-struggle-this-time.pdf

৭ মার্চের ভাষণের দলিলপত্র

দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মার্চ ১৯৭১-এর ঘটনাসমূহ

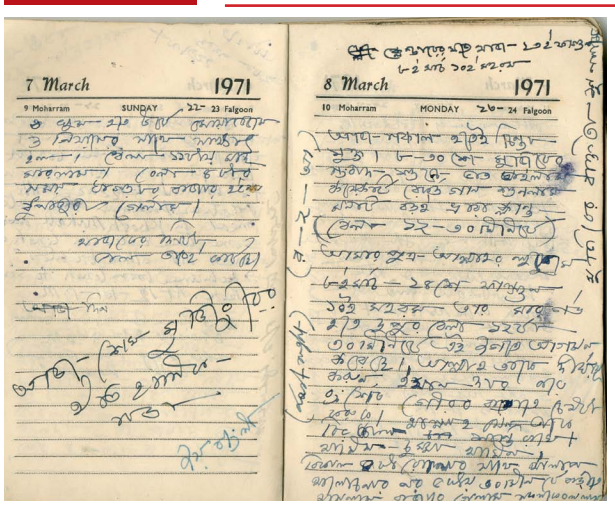

৭ মার্চ সন্ধ্যায় বিদেশি সাংবাদিকদের আওয়ামী লীগ প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

এম. এ. কে. ফজলে বারীর ডায়েরি থেকে

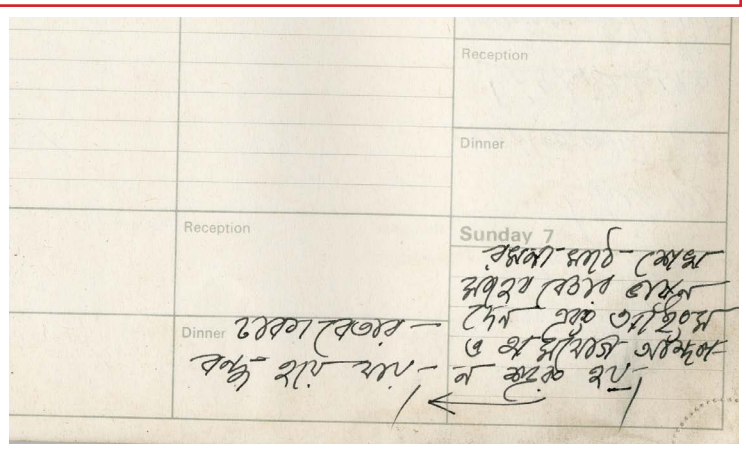

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র আইয়ুব-বিন-হায়দারের ডায়েরি থেকে

আর্ট কলেজের ছাত্র মরণ চাঁদ পাল-এর ডায়েরি

UNHCR-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি Johannas Van ber Klaauw এবং তাঁর দলের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

শনিবার, ৮ মার্চ ২০২১

UNHCR এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি Mr. Johannas Van ber Klaauw এবং তাঁর দল দুপুর ১টায় জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। ঘণ্টাখানেক পূর্বে তাঁর দল প্রাথমিকভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করে। আর্কাইভ ও ডিসপ্লে কর্মকর্তা মন্টু বাবু সরকার ও সুফিয়া নাজনীন নিতা তাদের সহযোগিতা করেন। আর্কাইভ কর্মকর্তা আমেনা খাতুন Mr. Johannas Van ber Klaauw-কে গ্যালারি পরিদর্শন করান। বিশেষ করে শরণার্থী সেকশনটি তিনি ভালোভাবে পরিদর্শন করেন। ২ ঘণ্টা সময় ধরে গ্যালারি পরিদর্শন শেষে টাস্টিদের সাথে একটি বৈঠক করেন। ট্রাস্টি সদস্য সচিব সারা যাকেরের প্রতিনিধিত্বে প্রায় ঘণ্টাখানেকের বৈঠকেবাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দ্বীপাক্ষিক কিছু করা যায় কিনা এ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়:

- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ব-পরিমণ্ডলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জনমত সৃষ্টি বিষয়ে UNHCR দৃঢ়ভাবে কাজ করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে গভীরভাবে কাজ করায় তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
- UNHCR - এর সংগ্রহে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন দলিলপত্র আছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে এবং গবেষণার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করতে ট্রাস্টি মফিদুল হক Mr. Johannas Van ber Klaauw- কে অনুরোধ জানান।
- UNHCR এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ সহযোগিতায় রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ক প্রদর্শনী বা ভার্চুয়াল আলোচনা সভা হতে পারে বলে উভয়পক্ষের মধ্যে মত বিনিময় হয়।

বৈঠক শেষে তিনি মন্তব্য লিখেন।

আমেনা খাতুন
ব্যবস্থাপক, কিউরেশন এন্ড কনজারভেশন

মেকং এসে মিশে পদ্মা-মেঘনার স্রোতে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহু মানুষের অবদান এবং ভূমিকা পালন দ্বারা যে-সমৃদ্ধি ও সক্ষমতা অর্জন করেছে তা' নানাভাবে ইতিহাসের বিস্তার ঘটাচ্ছে, একাত্তরের গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত করছে বিশ্বের অন্য অনেক দেশের গণহত্যার ইতিহাস, সেইসাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নীরবে নিভৃতে অন্তরালে অনেক ভূমিকা পালন করছে। এই ভূমিকার প্রকাশ ঘটেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ থেকে ২৬ মার্চ, ২০২১ আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে।

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি বিভিন্ন দিন বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান নিবেদনের যে উদ্যোগ নিয়েছে সেখানে ২৫ মার্চ বাংলাদেশের গণহত্যা স্মরণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিবেশনায় সহায়তা চেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। তিরিশ মিনিটব্যাপী এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কাম্বোডিয়ার গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া বালক আর্ন গঠিত শিল্পীদলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। পরিণত বয়সে তিনি গঠন করেছেন গানের দল। খেমার ম্যাজিক মিউজিক বাস নামের এই দলটি ঐতিহ্যবাহী বাদন ও সঙ্গীতের সদস্যদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে গণহত্যার শিকার মানুষ ও শিশুদের আনন্দদানের চেষ্টা করে। তারা তাদের গান ও বাদন রেকর্ড করে পাঠিয়েছে বাংলাদেশের অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের জন্য, শেষে যন্ত্রবাদন করেছে বাংলা গান, সব ক'টা জানালা খুলে দাও না, শহীদের স্মরণে যে গান মঞ্চে গাইবেন বাংলাদেশের শিল্পীরা। এই গানে সুর দিয়েছিলেন আহমদ ইমতিয়াজ বুলবুল, যিনি গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে, দেখেছেন হত্যা ও পীড়ন এবং পরে সাক্ষী দিয়েছিলেন বাংলাদেশের গণহত্যার বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে।

সঙ্গের ছবিতে দেখা যাচ্ছে কাম্বোডিয়ার বাদন-দলকে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ হেলেন জার্ভিসের মেকং নদীতীরের ছায়াঘেরা আবাসে তারা গানের রেকর্ড করার সময় তুলেছিল এই ছবি।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হবে এই অনুষ্ঠান, দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ আয়োজন 'মায়ের ভাষায় প্রাণের উচ্চার'

ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে আত্মপরিচয়ের সন্ধান দিয়েছিল। একুশের পথ ধরেই স্বাধীনতা, একুশের পথ ধরেই বিশ্বজুড়ে মাতৃ ভাষার মর্যাদা। একুশ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ আয়োজনে দেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত এবং নত্যু পরিবেশিত হয় 'একুশের পথ ধরে স্বাধীনতা' শিরোনামে মূল বক্তব্য প্রদান করেন লেখক ও সাংবাদিক আনিসুল হক। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের অনুপ্রেরণায় বিশেষ একুশের গান পরিবেশন করে ব্যান্ড দল সাধু।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগ

গণহত্যা মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে আলোচনা

Global Virtual Conference on Commemorating Past Genocides and Learning to Prevent Atrocity Crimes

১২ মার্চ, ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে ১২ মার্চ ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ জুড়ে আয়োজিত হলো বিশ্বজনীন আলোচনা, যেখানে গণহত্যা বিষয়ে খ্যতিমান গবেষক, গণহত্যা-প্রতিরোধে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ট্রাস্টিদের তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তরুণ স্বেচ্ছাকর্মীদল প্রায় তিন মাসের প্রস্তুতি ও শ্রম দ্বারা সার্থকভাবে এই বৈশ্বিক সম্মেলন সম্পন্ন করেছে। বাংলদেশের গণহত্যাসহ বিভিন্ন সময়ে বিশ্বজুড়ে সংগঠিত নিষ্ঠুরতা বিষয়ে নানা দিক থেকে আলোকপাত করেন বিশেষজ্ঞরা।

অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ ছিল :

Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Timor Leste, Myanmar, UK, Switzerland, Belgium, Poland, Netherlands, Kenya, Somaliland, Tanzania, Uganda, Australia, New Zealand Argentina, USA, Canada, Cambodia , Egypt, Turkey

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে অংশীদারিত্ব নেয়া সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল :

University of Cambridge, University of Melbourne , Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, University of Ottawa, Australia National University, Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, Center for the Study of Genocide and Justice, The Iraq Project, Asia Justice and Rights, South Asian University, EL-COP, Never Again Association, Ghatak Dalal Nirmul Committee, International Centre for Ethnic Studies , Texas A & M University, Centro National Chega, IP Da Memoria A Esperanza, University of Hargeisa, Somaliland , VOW Media and the Committee for Social Justice, Institute for Creativity Arts, and Technology, Virginia Tech USA, Swisspeace

২৪ ঘণ্টায় অনুষ্ঠিত ২৭টি অধিবেশনে ৭৫ জন বক্তা অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন সম্পর্কে জানতে অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পাতায় https://www.facebook.com/liberationwarmuseum.official যেতে পারেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের গণহত্যার বিস্তারিত দিক তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে এই গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কাজ করছে। ২০১২ সাল থেকে এই কাজে নতুন মাত্রা যোগ করেছে সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস। কেন্দ্রের কার্যক্রমের সঙ্গে দেশের প্রখ্যাত গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন পৃথিবীর নানা দেশের বিশেষজ্ঞগণ। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় তারা বাংলাদেশে এসেছেন, সেন্টারের কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন এবং বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন এই কাজে যুক্ত তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাকর্মীদের। এই কর্মকাণ্ড নতুন মাত্রায় বি-কশিত হয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সমর্থনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ দ্বারা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এমনি অভিজ্ঞতা, যোগাযোগ ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের গণহত্যার পঞ্চাশতম বার্ষিকী ঘিরে বিশ্ব পরিসরে বড়মাপের উদ্যোগ গ্রহণের চিন্তা আমাদের ছিল। সেই লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আবেদন জানানো হয়েছিল একটি গোট দিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গবেষকবৃন্দ বাংলাদেশের গণহত্যা এবং অন্যান্য গণহত্যা নিয়ে আলোচনা করবেন। নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু হয়ে জাপান, কোরিয়া, এশীয় দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ হয়ে এই আলোচনা ল্যাটিন আমেরিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় গিয়ে সমাপ্ত হবে।

এই অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ সার্থকভাবে সমাপ্ত হয়েছে ১২ মার্চ, ২০২১। জাদুঘরের তরুণ স্বেচ্ছাকর্মী এবং সেন্টারের পরিচালকবৃন্দ শ্রম ও দক্ষতা নিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত ও পরিচালিত বিশ্বজনীন উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করলো। এর মধ্য দিয়ে একাত্তরে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি গবেষক ও বিশ্বমহলে নতুনমাত্রা অর্জন করলো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তার বর্তমান সংখ্যায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো। আশা করা যায়, আগামী সংখ্যায় আরো বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা যাবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড হিসেবে স্বীকৃতির সনদ ও দলিল

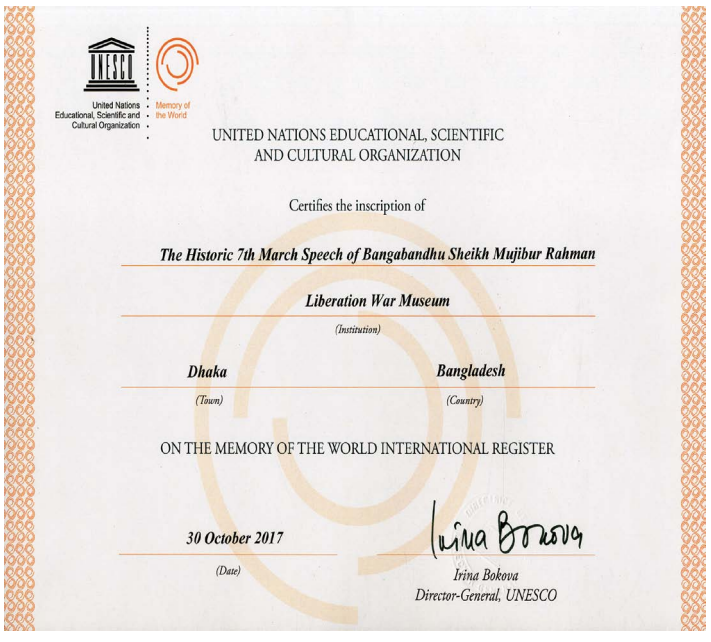

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Memory of the World

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Liberation War Museum

(Institution)

Dhaka (Town) — *Bangladesh* (Country)

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

30 October 2017 (Date)

Irina Bokova
Director-General, UNESCO

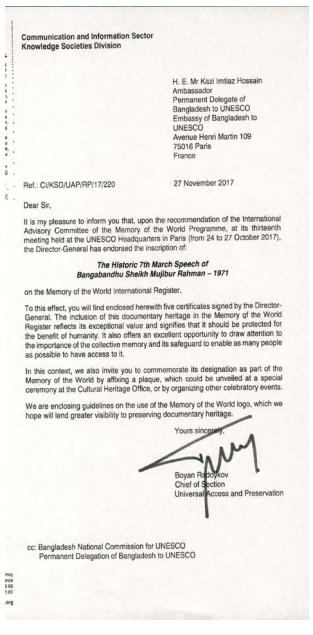

Communication and Information Sector
Knowledge Societies Division

H. E. Mr Kazi Imtiaz Hossain
Ambassador
Permanent Delegate of Bangladesh to UNESCO
Embassy of Bangladesh to UNESCO
Avenue Henri Martin 109
75016 Paris
France

Ref.: CI/KSD/UAP/RP/17/220 — 27 November 2017

Dear Sir,

It is my pleasure to inform you that, upon the recommendation of the International Advisory Committee of the Memory of the World Programme, at its thirteenth meeting held at the UNESCO Headquarters in Paris (from 24 to 27 October 2017), the Director-General has endorsed the inscription of:

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman – 1971

on the Memory of the World International Register.

To this effect, you will find enclosed herewith five certificates signed by the Director-General. The inclusion of this documentary heritage in the Memory of the World Register reflects its exceptional value and signifies that it should be protected for the benefit of humanity. It also offers an excellent opportunity to draw attention to the importance of the collective memory and its safeguard to enable as many people as possible to have access to it.

In this context, we also invite you to commemorate its designation as part of the Memory of the World by affixing a plaque, which could be unveiled at a special ceremony at the Cultural Heritage Office, or by organizing other celebratory events.

We are enclosing guidelines on the use of the Memory of the World logo, which we hope will lend greater visibility to preserving documentary heritage.

Yours sincerely,

Boyan Radoykov
Chief of Section
Universal Access and Preservation

cc: Bangladesh National Commission for UNESCO
Permanent Delegation of Bangladesh to UNESCO

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তীতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট সদস্যের বার্তা

Good afternoon or for you soon good Morning. Long Time not having had direct chances for continuing the exchange of views on developments both in our countries, regions and globally. and as this kind of Social and information Media is reminding about yours 25th anniversary working for the LWM I wanted to use this opportunity to thank you, dedicating so much patience and intense work into this important project. So much needed investment into youth and by that for a human, peaceful future of our societies, enabling the young people to look at the world around them and to shape their country in solidarity and Peace with othery, opening the chance to avoid mistakes made by their parents or grand parents another time.

Thank you
Best
Helmut Scholz
Member, European Parliament from Die Linke (Left Party)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টার, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official